ZAHIR RAIHAN

GOLPO SOMOGRO

গল্প সমগ্র
জহির রায়হান

সূচিপত্র

সোনার হরিণ/৯
সময়ের প্রয়োজনে/১২
একটি জিজ্ঞাসা/২২
হারানো বলয়/২৪
বাঁধ/২৯
সূর্যগ্রহণ/৩৫
নয়া পত্তন/৪১
মহামৃত্যু/৪৬
ভাঙাচোরা/৫১
অপরাধ/৫৭
স্বীকৃতি/৬২
অতি পরিচিত/৬৯
ইচ্ছা অনিচ্ছা/৭৩
জন্মান্তর/৭৯
পোস্টার/৮৫
ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি/৯২
কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ/৯৫
কয়েকটি সংলাপ/৯৬
দেমাক/১০১
ম্যাসাকার/১০৬
একুশের গল্প/১১৯

সোনার হরিণ

দীর্ঘ দশবছর পর অকস্মাৎ আজ যদি তাদের একজনের সঙ্গে দেখা না হত, তাহলে হয়তো এ গল্পের জন্ম হত না কোনোদিন।

দশ বছর আগে, ফার্নিচারের দোকানে কিছুদিনের জন্যে চাকরি নিতে হয়েছিল আমার। দোকানটা ছিল আকারে বেশ বড় আর প্রকারে অভিজাত। বাইরে, নাতি-প্রশস্ত সাইনবোর্ডে সুন্দর করে নাম লেখা ছিল তার, আর ভেতরে পরিপাটি করে সাজানো ছিল বিক্রয়ের সামগ্রীগুলো।

হয়তো তখন ভরদুপুর ছিল। কড়া রোদ পড়ছিল বাইরে, বেশ মনে আছে। আয়নার দরজাটা ঠেলে দোকানে এল তারা। প্রথমে যে এল, বয়স তার উত্তর-তিরিশের আশেপাশে হবে। দেহের রং কালো, তীক্ষ্ণ চেহারা, পরনে একটা ছাই রঙের প্যান্ট, গায়ে সাদা সার্ট। পেছনে যে এল, সে একটি মেয়ে। পাতলা গড়ন, মিষ্টি মুখ। চোখজোড়া কালো আর ডাগর।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এই যে আসুন, বসুন।

ওরা কেউ বসল না। দুইজনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারপাশে সাজানো ফার্নিচারগুলো দেখতে লাগল।

বললাম, আপনারা নিশ্চয় ফার্নিচার দেখতে এসেছেন?

দুইজনে একসঙ্গে সায় দিল। হ্যাঁ।

বললাম, তাহলে দেখুন যেরকমটি চাই আপনাদের সব রকমের জিনিস পাবেন এখানে। আর যদি তৈরী-জিনিস পছন্দ না হয়, ইচ্ছে করলে আপনারা অর্ডার দিয়ে যেতে পারেন, আমরা ঠিক আপনাদের মনের মতো করে বানিয়ে দেব। ধড়িবাজ আমরা নই।

তারা দুইজনে এতক্ষণ নীরবে শুনছিল সব আর মাঝে মাঝে দুইজোড়া চোখ চরকির মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল চারপাশ। আমাকে থামতে দেখে লোকটা বলল, আমাদের অনেকগুলো ফার্নিচার দরকার বুঝলেন? মানে পুরো একটা ঘর সাজাতে যা লাগে— যেমন ধরুন একটা আলমারি, একটা সুন্দর ড্রেসিংটেবিল, একখানা মজবুত খাট। একটা সোফাসেট। তাছাড়া বুঝলেন কিনা, একটা আরাম-কেদারার বড় শখ আমার—কী সুন্দর হাতপা ছড়িয়ে বসা যায় তাই না?

বললাম, ঠিক বলেছেন আপনি, তাইতো এর নাম আরাম-কেদারা। আরাম করে বসবার জন্যেইতো ওগুলো তৈরী। আর সত্যি বলতে কি, এই কিছুদিন আগে এক মাড়োয়ারি, পাঁচখানা আরাম-কেদারার অর্ডার দিয়ে গেছেন, দু-একদিনের মধ্যে এসে নিয়ে যাবেন। আসুন না, আপনারা নিজে চোখে দেখুন। না না বসায় কোনো আপত্তি নেই, বসুন। বসেই দেখুন।

একখানা কেদারার উপর লম্বা হয়ে বসল লোকটা। তার চোখমুখ যেন কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু পরে সে প্রশ্ন করল, এর দাম কত পড়বে?

বললাম, আপনাদের কাছে বেশি দাম চাইব না। হাজার হোক আপনারা হলেন বাঙালি, জাত ভাই। মাড়োয়ারিটার কাছ থেকে দেড়'শ করে নিচ্ছি। আপনাদের সোয়া'শ টাকায় দিয়ে দেব।

লোকটা আঁতকে উঠল, সোয়া'শ!

বললাম, কী করব বলুন, আমরা তো ঠকাবার জন্যে ব্যবসা করছিনে। অনেক মাল-মসলা খরচ করে জিনিস তৈরি করি। দামটা একটু বেশি পড়বে বইকি। অন্য কোথাও গেলে—না খুব বেশি দূর যেতে হবে না আপনাদের, এই পাশের দোকানটিতে যান, দেখবেন কত মিষ্টি কথা বলে এর চেয়ে হয়তো কম দামে একখানা কেদারা গছিয়ে দেবে আপনাকে। আপনি তো ভাবলেন খুব জিতেছেন, কিন্তু বাড়ি নিয়ে যান, আমি হলপ করে বলছি, খুবজোর ছ'মাস কি এক বছর, তার পরেই দেখবেন ওটা উইয়ে খেতে শুরু করেছে। আসলে কি জানেন—।

আরো কী যেন বলতে চাইছিলাম আমি। মেয়েটি মাঝখানে বাধা দিল। এতক্ষণ ডাগর চোখজোড়া মেলে একখানা ড্রেসিংটেবিল দেখছিল সে। হঠাৎ ডেকে বলল, দ্যাখো কী সুন্দর টেবিল। বলতে গিয়ে মুখখানা শিশুর সরল হাসিতে ভরে উঠল তার। কাচের ভেতরে নিজের চেহারাটা একনজর দেখে প্রশ্ন করল আমাকে, এটার দাম কত?

বললাম, বেশি না, দু'শ পঁচাত্তর টাকা।

মুহূর্তে মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ভ্রূজোড়া কপালে তুলে সে মৃদুস্বরে বলল, এত টাকা!

বললাম, হ্যাঁ... কিছু বলতে চাইলাম আমি। কিন্তু কেন যেন গলায় আটকে গেল কথাটা। অবশেষে বলতে হল— 'দেখুন, দু'শ পঁচাত্তর টাকা নগদ দিলেও এ মুহূর্তে ও জিনিসটা দিতে পারব না আপনাকে। এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়েতে প্রেজেন্ট করবে বলে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে ওটা বানিয়েছেন। যদি বলেন আপনাদেরও ওরকম একখানা তৈরি করে দিতে পারি।'

ড্রেসিংটেবিলটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরো অনেকক্ষণ ধরে দেখল ওরা। তার পর একে একে একখানা খাট, কয়েকটা আলমারি আর একটা সোফাসেটের মূল্য জানতে চাইল ওরা।

যা সঠিক দর তাই শুধু বললাম, উত্তরে ওরা বিস্ময় প্রকাশ করল।

এতক্ষণে ওদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল আমার। কথায় কথায় ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেললাম। বছর কয়েক হল বিয়ে হয়েছে ওদের। শহরেই থাকে। লোকটি চাকরি করে কোনো এক সরকারি অফিসে। বড় খাটুনির কাজ। তবু, এ ক'বছরে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছে ওরা। এখন কিছু ফার্নিচার কিনে ঘরটাকে সাজাতে চায়। এইতো সময়। পরে ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকলে কি আর এসব কেনাকাটা করা সম্ভবপর হবে? মোটেই না।

আলাপের অবসরে পাশের রেস্তোরাঁয় দুকাপ চা আর বিস্কিটের ফরমায়েশ দিয়েছিলাম। চা খেতে অনুরোধ করায় দুজনেই যেন লজ্জা পেলেন। মেয়েটি কিছু বলল না। নীরবে চা খেল। চা খাওয়া শেষ হলে বললাম, তাহলে কি আপনারা এখন কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে যাবেন?

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল এক পলক, তারপর একটু ইতস্তত করে লোকটি বলল, এখন সাথে কোনো টাকা আনিনি আমরা। কাল সকালে এসে আলমারি, খাট, ড্রেসিংটেবিল আর কেদারাটার জন্যে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে যাব আপনাকে।

মেয়েটি বলল, দেখবেন, যেন খারাপ না হয়।

বললাম, সে কথা কি আর বলতে। জিনিস খারাপ হলে, আমাদেরই বদনাম। আপনারা ও-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

একটু পরে কাচের দরজাটা ঠেলে যেমনি এসেছিল তেমনি নীরবে বেরিয়ে গেল তারা।

তারপর সে দোকানে আরো তিন বছর ছিলাম আমি।

পরদিন লোকটা আসবে বলেছিল।

পরের বছরেও এল না।

তার পরের বছরেও না।

তারপর দীর্ঘ দশ বছর। অকস্মাৎ আজ যদি তাদের একজনের সঙ্গে দেখা না হয়ে যেত তাহলে হয়তো এ গল্পের জন্ম হত না কোনোদিন।

মেয়েটি হয়তো মারা গেছে এতদিনে, তাই আজ তাকে সঙ্গে দেখলাম না লোকটির। দেখলাম, এক বন্ধুর ফার্নিচারের দোকানে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসে হঠাৎ দেখলাম এ ক'বছরে রীতিমতো বুড়ো হয়ে গেছে লোকটা। মুখখানা ভেঙে গেছে, কানের গোড়ায় কিছু চুল সাদা। গায়ের জামা-কাপড়গুলো ময়লা। দোকানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনেকটা কান্নার মতো স্বরে সে বলছে, আমাদের অনেকগুলো ফার্নিচার দরকার, বুঝলেন? মানে, পুরো একটা ঘর সাজাতে যা লাগে। যেমন ধরুন, একটা সুন্দর ড্রেসিংটেবিল, একখানা মজবুত খাট—তাছাড়া বুঝলেন কিনা, একটা আরাম-কেদারার বড় শখ আমার। কী সুন্দর হাতপা ছড়িয়ে বসা যায়, তাইনা?

সময়ের প্রয়োজনে

কিছুদিন আগে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম। ক্যাম্প-কমান্ডার ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মুহূর্তে আমার দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি বসুন। এই খাতাটা পড়ুন বসে বসে। আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই। তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ করব।

খাতাটা হাত বাড়িয়ে নিলাম।

লাল মলাটে বাঁধানো একটা খাতা। ধুলো, কালি আর তেলের কালচে দাগে ময়লা হয়ে গেছে এখানে-সেখানে।

খাতাটা খুললাম।

মেয়েলি ধরনের গোটা-গোটা হাতে লেখা।

মাঝে মাঝে একটু এলোমেলো।

আমি পড়তে শুরু করলাম।

প্রথম প্রথম কাউকে মরতে দেখলে ব্যথা পেতাম। কেমন যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়তাম। কখনও চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রু হয়তো জন্ম নিত। এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। কী জানি, হয়তো অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, তাই। মৃত্যুর খবর আসে। মরা মানুষ দেখি। মৃতদেহ কবরে নামাই। পরক্ষণে ভুলে যাই।

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছোট্ট টিলারটার ওপরে এসে দাঁড়াই। সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। বাতাসে মৃদু দুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম। খবর এসেছে ওখানে ঘাঁটি পেতেছে ওরা। একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল। একসঙ্গে থেকেছি। শুয়েছি। খেয়েছি। ঘুমিয়েছি। এক টেবিলে বসে গল্প করেছি। প্রয়োজনবোধে ঝগড়া করেছি। ভালোবেসেছি। আজ তাদের দেখলে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে ওঠে। হাত নিশপিশ করে। পাগলের মতো গুলি ছুড়ি। মারার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠি। একজনকে মারতে পারলে উল্লাসে ফেটে পড়ি। ঘৃণার থুতু ছিটোই মৃতদেহের মুখে।

সামনে ধানক্ষেত। আলের ওপরে কয়েকটা গরু। একটা ছাগল। একটানা ডাকছে। একঝাঁক পাখি উড়ে চলে গেল দূরে গ্রামের দিকে। কী যেন নড়েচড়ে উঠল সেখানে। মুহূর্তে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ক্যাম্প-কমান্ডারকে খবর দিলাম।

স্যার, মনে হচ্ছে ওরা এগুতে পারে।

তিনি একটা ম্যাপের ওপরে ঝুঁকে পড়ে হিসেব কষছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। একজোড়া লাল চোখ। গত দু-রাত ঘুমোননি। অবকাশ পাননি বলে। তিনি তাকালেন।

বললেন, কী দেখেছ?

বললাম, মনে হল একটা মুভমেন্ট।

ভুল দেখেছ। আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তিনি। ওদের দু-একদিনের মধ্যে এগুবার কথা নয়। যাও ভালো করে দেখ।

চলে এলাম নিজের জায়গায়। একটানা তাকিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে তন্দ্রা এসে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। হয়তো তাই ভুল দেখি।

কিন্তু বুড়িগঙ্গার পাশে লঞ্চঘাটের অপরিসর বিশ্রামাগারে যে-দৃশ্য দেখেছিলাম সেটা ভুল হবার নয়। শুনেছিলাম, বহুলোক আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। যখন গেলাম, দেখলাম কেউ নেই।

দেখলাম।

মেঝেতে পুডিং-এর মতো জমাট রক্ত।

বুটের দাগ।

অনেকগুলো খালি পায়ের ছাপ।

ছোট পা। বড় পা। কচি পা।

কতগুলো মেয়ের চুল।

দুটো হাতের আঙুল।

একটা আংটি।

চাপ চাপ রক্ত।

কালো রক্ত। লাল রক্ত।

মানুষের হাত। পা। পায়ের গোড়ালি।

পুডিং-এর মতো রক্ত।

খুলির একটা টুকরো অংশ।

এক খাবলা মগজ।

রক্তের ওপরে পিছলে-যাওয়া পায়ের ছাপ।

অনেকগুলো ছোট-বড় ধারা। রক্তের ধারা।

একটা চিঠি।

মানিব্যাগ।

গামছা।

একপাটি চটি।

কয়েকটা বিস্কুট।

জমে থাকা রক্ত।

একটা নাকের নোলক।

একটি চিরুনি।

বুটের দাগ।

লাল হয়ে যাওয়া একটা সাদা ফিতে।

চুলের কাঁটা।

দেশলাইয়ের কাঠি।

একটা মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ।

রক্তের মাঝখানে এখানে-ওখানে অনেকগুলো ছড়ানো।

পাশের নর্দমাটা বন্ধ।

রক্তের স্রোত লাভার মতো জমে গেছে সেখানে।

দেখছিলাম।

দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিলাম সেখান থেকে।

আমি একা নই। অসংখ্য মানুষ।

অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটছিল।

মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের পুঁটলি। হাতে হ্যারিকেন। কোমরে বাচ্চা।

চোখেমুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক।

কথা নেই। মৌন সবাই।

সহসা কে যেন বলল, ওদিকে যাবেন না। মিলিটারি। নৌকায় করে করে লোকজন সব ওপারে পালাচ্ছিল। মিলিটারি ওদের ওপরে গুলি করেছে। দু-তিন শ' লোক মারা গেছে ওখানে। যাবেন না।

মনে হল পায়ের সঙ্গে যেন কয়েক মণ পাথর বেঁধে দিয়েছে কেউ।

একা নই। অসংখ্য মানুষ। সহস্র চোখ। হতবিহ্বল মুহূর্ত। কোন্‌দিকে যাব। পেছনে ফিরে যাবার পথ নেই। মৃতদেহের স্তূপের নিচে সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

সামনে এগিয়ে যাব। ভরসা পাচ্ছিনে। সেখানেও হয়তো মৃতের পাহাড় পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কোন্‌দিকে যাব?

পরমুহূর্তে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটতে লাগলাম আমরা। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। কাঁচকি মাছের মতো চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে সবাই।

হেলিকপ্টার মাথার উপরে নেমে এল।

তারপর।

তারপর মনে হল একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ পড়ল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চাদের কান্না। কতকগুলো মানুষের আর্তনাদ। কাতরোক্তি। কয়েকটা কুকুরের চিৎকার কান্না। মেশিনগানের শব্দ। মানুষের বিলাপ। একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর। বা'জান।

বা'জান। হারিয়ে যাওয়া বাবাকে ডাকছে সে। বা'জান। বা'জান। তারপর শ্মশানের নীরবতা। ঘাড়ের কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম। না, কিছুই দেখতে পেলাম না। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। মনে হল চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে। বুঝতে পারলাম জ্ঞান হারাচ্ছি। কিংবা মারা যাচ্ছি।

সামনে ধানক্ষেত। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। ওখানে আমরা থাকি।

মোট সাতাশজন মানুষ।

প্রথম উনিশজন ছিলাম। আটজন মারা গেল মর্টারের গুলিতে। ওদের নামিয়ে দিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম, তখন আমরা এগারজন।

একজন পালিয়ে গেল সে-রাতে। গেল, আর এল না। আর একজন মারা গেল হঠাৎ অসুখ করে। কী অসুখ বুঝে উঠবার আগেই হাত-পা টান টান করে শুয়ে পড়ল সে। আর উঠল না। তার বুকপকেটে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। মায়ের কাছে লেখা। মা। আমার জন্যে তুমি একটুও চিন্তা কোরো না, মা। আমি ভালো আছি।

চিঠিটা ওর কবরে দিয়ে দিয়েছি। থাক। ওখানেই থাক। তখন ছিলাম ন'জন। এখন আবার বেড়ে সাতাশে পৌঁছেছি।

সাতাশজন মানুষ।

নানা বয়সের। ধর্মের। মতের।

আগে কারো সঙ্গে আলাপ ছিল না। পরিচয় ছিল না। চেহারাও দেখিনি কোনোদিন।

কেউ ছাত্র ছিল। কেউ দিন-মজুর। কৃষক। কিংবা মধ্যবিত্ত কেরানি। পাটের দালাল। অথবা পদ্মাপারের জেলে।

এখন সবাই সৈনিক।

একসঙ্গে থাকি। খাই। ঘুমোই।

রাইফেলগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে যখন কোনো শত্রুর সন্ধানে বেরোই তখন মনে হয় পরস্পরকে যেন বহুদিন ধরে চিনি। জানি। অতি আপনজনের মতো অনুভব করি।

মনে হয় দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ আমরা। আমাদের অস্তিত্ব ও লক্ষ্য দুই-ই এক। মাঝে মাঝে বিশ্রামের মুহূর্তে গোল হয়ে বসে গল্প করি আমরা।

অতীতের গল্প।

বর্তমানের গল্প।

ভবিষ্যতের গল্প।

টুকিটাকি নানা আলোচনা।

ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে। ক'দিন ধরে শুধু ডাল-ভাত চলছে। একটু মাছ আর মাংস পেলে মন্দ হত না। সাতাশজন মানুষ আমরা। মাত্র ন'টা রাইফেল। আরো

যদি অস্ত্র পেতাম। সবার হাতে যদি একটা করে রাইফেল থাকত, তাহলে সেদিন ওদের একজন সৈন্যকেও পালিয়ে যেতে দিতাম না।

মোট দু'শ জনের মতো এসেছিল ওরা। পঁয়তাল্লিশটা লাশ পেছনে ফেলে পালিয়েছে। তাড়া করেছিলাম আমরা। খেয়াপার পর্যন্ত। গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফিরে চলে এসেছি।

এসে দেখি আশেপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-গেরস্তবাড়ির বউ ছুটে এসেছে সেখানে।

কারো হাতে ঝাঁটা। দা। কুড়োল। খুন্তি।

মৃতদেহগুলোর মুখে ঝাঁটা মারছে ওরা।

কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে ওদের হাত। পা। মাথা। বুকের পাঁজর। দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে একটি মৃতদেহকে শত টুকরো করতে করতে জনৈক বৃদ্ধ চিৎকার করে কাঁদছিল। আমার পুলাডারে মারছস। বউডারে নিয়া গেছস। মাইয়াডারে পাগল করছস। আমার সোনার সংসার পুড়ায়া দিছস।

আল্লাহর গজব পড়ব। আল্লার গজব পড়ব।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

আমরা বাধা দিলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল ওরা। করুণ বিলাপ শুরু করল। বিলাপের অবসরে নিজেদের সহস্র দুঃখ-বেদনার ইতিহাস বর্ণনা করতে লাগল।

ছেলে নেই। স্বামী নেই। স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে। যুবতী মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। তিন মাস হল। হালের গরু। গোলার ধান। গায়ের অলঙ্কার। কিছু নেই। সব লুট করেছে।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

এত সব বুকে নিয়ে ওরা বাঁচবে কেমন করে। একটা বিস্ফোরণে যদি সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেত তাহলে হয়তো বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে পারত ওরা।

ওরা একা নয়। অনেকগুলো মানুষ। সাড়ে সাতকোটি। এককোটি লোক ঘর-বাড়ি-মাটি ছেড়ে পালিয়েছে। তিনকোটি লোক সারাক্ষণ পালাচ্ছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

ভয়। ত্রাস। আতঙ্ক।

জ্ঞান ফিরে এলে আমিও পালিয়েছিলাম। পোড়ামাটির ঘ্রাণ নিতে নিতে। অনেকগুলো মৃতদেহ ডিঙিয়ে। কালো ধুঁয়োর কুণ্ডলী ভেদ করে।

একটা গহনা-নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছেলে বুড়ো মেয়ে বাচ্চারেত গিজগিজ করছিল সেটা। দু-পাশের গ্রামগুলোতে আগুন জ্বলছে।

কিছুক্ষণ আগে কয়েকটা প্লেন এসে একটানা বোমাবর্ষণ করেছে সেখানে।

কাছেই একটা মফস্বল শহর। এখনও পুড়ছে। কালো জমাট ধুঁয়ো কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। একটা মানুষ নেই। কুকুর নেই। জন্তু জানোয়ার নেই। শূন্য বাড়িগুলো প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে। সহসা অনেকগুলো মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তাকিয়ে দেখলাম। দূরে নদীর পারে একসঙ্গে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলো মেয়ে চিৎকার করে নৌকাটাকে পাড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ডাকছে। ওরা আশ্রয় পেতে চায় নৌকাতে।

না, না, খবরদার, নৌকা ভেড়াবে না। জনৈক বৃদ্ধা ওদের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল।

কেন, কী হয়েছে?

কী আর হবে? বাজে মেয়ে। বাজারের মেয়ে।

বাজারের মেয়ে মানে?

মানে আবার কী সাহেব। বেশ্যা। বেশ্যা চেনেন না। ঘৃণায় চোখমুখ কুঁচকে এল তার।

তার একার নয়। অনেকের।

অনেকেই মুখ বার করে তীরে দাঁড়িয়ে-থাকা বেশ্যাগুলোকে দেখল। না না। নৌকা থামাবার দরকার নেই। আপদগুলো মরুক। মরলেই ভালো।

নৌকা থামাও। সহসা ভিড়ের ভেতর থেকে একটা ছেলে চিৎকার করে উঠল। মুখভরা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। রক্তজবার মতো লাল চোখ। শিগগির নৌকাতে তুলে নাও ওদের। কঠিন কণ্ঠে আদেশ করল সে। উত্তরে বুড়োটা বিরক্তি প্রকাশ করল। না, নৌকা থামাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে সামনে লাফিয়ে এসে বুড়োটার গলা চেপে ধরল ছেলেটা। কুত্তার বাচ্চা। তোমাকে এক্ষুনি তুলে ঐ নদীর জলে ফেলে দেব আমি। কোন্ শালা শুওরের বাচ্চা আছে এখানে বাধা দেয় আমাকে।

নৌকা ভেড়াও মাঝি। ওদের তুলে নাও।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। নৌকা ভিড়ল।

ভয়ে আতঙ্কে অর্ধমৃত বেশ্যাগুলো ভেড়ার পালের মতো নৌকায় এসে চড়ল।

ছোট বেশ্যা। মাঝারি বেশ্যা। বড় বেশ্যা।

কিশোরী বেশ্যা। যুবতী বেশ্যা। বৃদ্ধা বেশ্যা।

ঘৃণায় একপাশে সরে গেল নৌকার কুলীন যাত্রীরা। বেশ্যারা কোনো কথা বলল না। এককোণে গাদাগাদি করে বসল।

অনেকগুলো মুখ।

একটি মুখ আমার মায়ের মতো দেখতে।

মা এখন কী করছে?

মায়ের কথা মনে পড়তে বুকটা ব্যথা করে উঠল।

ছোট ভাই। বোন ইতুদি। ওরা কেমন আছে?
বেঁচে আছে না মরে গেছে?
জানি না। হয়তো বহুদিন জানব না।
তবু একটা কথা বারবার মনের মধ্যে উঁকি দেয় আমার।
আবার কি ওদের সঙ্গে একসাথে নাস্তার টেবিলে বসতে পারব আমি?
আবার কি রোজ সকালে মা আমার বন্ধ দুয়ারে এসে কড়া নেড়ে ডাকবে? কিরে, এখনো ঘুমোচ্ছিস? অনেক বেলা হয়ে গেল যে।
ওঠ। চা খাবি না?
কিংবা।
দল বেঁধে সবাই বাড়ির ছাতের ওপর কেরাম খেলা। পারব কি আবার?
অথবা।
মাকে সাক্ষী রেখে, সবাই মিলে বাবার পকেট মারা? হয়তো। জানি না।
জানতে গেলে ভাবনা হয়। ভাবনাটাই একটা যন্ত্রণা। অথচ ভাবতে আমি এককালে ভীষণ ভালোবাসতাম। বিশেষ করে জয়াকে নিয়ে।
চিনু ভাবীর জয়া। কতভাবে ভেবেছি ওকে।
কখনো সমুদ্রের উত্তাল পটভূমিতে।
কখনো ঢেউ-জাগানো মিছিলের মাঝখানে।
কখনো ছোট্ট একটি ঘরের একান্তে। দিনে। রাতে।
অন্ধকারের নিবিড়তায়।
কিংবা কোনো দুপুরে। কোনো রেস্তোরাঁর কোণের টেবিলে। নিরিবিলি নির্জনে। দু-কাপ চা সামনে রেখে অনেকক্ষণ ধরে কোনো কথা না বলে বসে-থাকার মুহূর্তে। ভাবতে ভালো লাগত।
ইছামতী, করতোয়া, ময়ূরাক্ষী বলে যে-নদীর নাম, তার জলে দুজনে সাঁতার কেটে ঢেউয়ের সঙ্গে কানামাছি খেলতে।
জয়া কোনোদিন সমুদ্র দেখেনি। সমুদ্র দেখার বড় ইচ্ছে ছিল তার।
একদিন হাসতে হাসতে বলল, জানো, সমুদ্র দেখে এলাম। কখন! কোথায়? অবাক হয়েছিলাম আমি।
কেন, এই শহরে? কপালে জমে-ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো আঁচল দিয়ে মুছে দিয়ে বলেছিল জয়া। শহরের অলিতে-গলিতে এত সমুদ্রের ছড়াছড়ি জীবনে দেখেছ কখনো?
জনতার সমুদ্র।
সমুদ্রের চেয়ে গভীর।
সাগরের চেয়েও উত্তাল।
গতিময়।
মনে হচ্ছিল সামনে যত বাধার পাহাড় আসুক-না কেন, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কোটি কোটি মুখ। পাথরে খোদাই-করা চেহারা। মুষ্টিবদ্ধ হাত সীমানা ছাড়িয়ে। লক্ষ-কোটি বজ্রের শব্দ কিংবা ঢেউয়ের ধ্বনি সে মিছিলের গর্জনের কাছে অর্থহীন।
আগে তো দেখিনি কোনোদিন।
বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে। চুয়ান্নতে। বাষট্টি, ছেষট্টি, কিংবা উনসত্তরে অনেক দেখেছি।
কিন্তু এত প্রাণের জোয়ার কখনো দেখিনি।
এত মৃত্যুও দেখিনি আগে।

সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। কয়েকটা লাউয়ের মাচা। কটি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম।
প্রতিদিন দেখি।
জয়াকেও এত নিবিড় করে দেখিনি কোনোদিন। পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। সে-দালানের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা এঁকেছি আমরা। ওগুলো মৃতের হিসেব।
আমাদের নয়।
ওদের।
যখনি কোনো শত্রুকে বধ করেছি তখনি একটা নতুন রেখা টেনে দিয়েছি দেয়ালে। হিসেব রাখতে সুবিধে হয় তাই। প্রায়ই দেখি। গুনি। তিন শ' বাহাত্তর, তিহাত্তর, চুয়াত্তর। পুরো দেয়ালটা কবে ভরে যাবে সে প্রতীক্ষায় আছি।
আমাদের যারা মরেছে। তাদের হিসেবও রাখি। কিন্তু সেটা মনে মনে। মনের মধ্যে অনেকগুলো দাগ। সেটাও মাঝে মাঝে গুনি।
একদিন।
বেশ কিছুদিন আগে। সেক্টর কমান্ডার এসেছিলেন আমাদের ক্যাম্পে, দেখতে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। অভিবাদন করেছিলাম তাঁকে।
তিনি আমাদের একটি প্রশ্ন করেছিলেন।
কেন যুদ্ধ করছ বলতে পার?
প্রায় একধরনের উত্তর দিয়েছিলাম আমরা।
বলেছিলাম, দেশের জন্যে। মাতৃভূমির জন্যে যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করছি দেশকে মুক্ত করার জন্যে।
বাংলাদেশ।
না। পরে মনে হয়েছিল উত্তরটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। নিজেরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি আমরা। উত্তরটা ঠিক হল কি?
দেশ তো হল ভূগোলের ব্যাপার। হাজার বছরে যার হাজারবার সীমারেখা পাল্টায়। পাল্টেছে। ভবিষ্যতেও পাল্টাবে।

তাহলে কিসের জন্যে লড়ছি আমরা?

বন্ধুরা নানাজনে নানারকম উক্তি করেছিল।

কেউ বলেছিল, আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে লড়ছি। ওরা আমাদের মা-বোনদের কুকুর-বেড়ালের মতো মেরেছে, তাই। তার প্রতিশোধ নিতে চাই।

কেউ বলেছিল, আমরা আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি। ওই শালারা বহু অত্যাচার করেছে আমাদের ওপর। শোষণ করেছে। তাই ওদের তাড়াবার জন্যে লড়ছি।

কেউ বলেছিল, আমি অতশত বুঝি না মিয়ারা। আমি শেখ সাহেবের জন্যে লড়ছি।

কেউ বলেছিল, কেন লড়ছি জান? দেশের মধ্যে যত গুণ্ডা-বদমাশ, ঠগ, দালাল, ইতর, মহাজন আর ধর্ম-ব্যবসায়ী আছে তাদের সবার পাছায় লাথি মারতে।

আমি ওদের কথাগুলো শুনছিলাম। ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তর্ক করছিলাম।

কিন্তু মন ভরছিল না।

কিসের জন্যে লড়ছি আমরা? এত প্রাণ দিচ্ছি, এত রক্তক্ষয় করছি?

হয়তো সুখের জন্যে। শান্তির জন্যে। নিজের কামনা-বাসনাগুলোকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্যে।

কিংবা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। অথবা, সময়ের প্রয়োজনে। সময়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে লড়ছি আমরা।

অতশত ভাবতে পারি না। আমার ছোট মাথায় অত ভাবনা এখন আর ধরে না। ব্যথা করে। যেটা বুঝি সেটা সোজা। আমাদের মাটি থেকে ওদেরকে তাড়াতে হবে। এটাই এখনকার প্রয়োজন।

দেয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে।

মনের দাগও বাড়ছে প্রতিদিন।

হাতের কব্জিতে এসে একটা গুলি লেগেছিল কাল। সেটা হাতে না-লেগে বুকে লাগতে পারত। মাত্র দু-আঙুলের ব্যবধান।

এখন ক'দিন বিশ্রাম।

মা কাছে থাকলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কাঁদত। বকুনি দিয়ে বলত। বাহাদুর। অত সামনে এগিয়ে গিয়েছিলি কেন? সবার পেছনে থাকতে পারলি না? আর অত বাহাদুরির দরকার নেই বাবা। ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরে চল্।

ঘর?

সত্যি, মানুষের কল্পনা বড় অদ্ভুত।

ঘর-বাড়ি কবে ওরা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। তবু ঘরের কথা ভাবতে মন চায়।

খবর পেয়েছি মা, বাবা, ভাই, বোন ওরা সবাই কোথায় যেন চলে গেছে। হয়তো কোনো গ্রামে, কোনো গঞ্জে। কোনো উদ্বাস্তু শিবিরে। কিংবা—

না। ওটা আমি ভাবতে চাই না।

জয়ার কোনো খবর নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?

জানি না। জানতে গেলে ভয় হয়।

শুধু জানি, এ যুদ্ধে আমরা জিতব আজ, নয় কাল। নয়তো পরশু।

একদিন আমি আবার ফিরে যাব। আমার শহরে, আমার গ্রামে। তখন হয়তো পরিচিত অনেকগুলো মুখ সেখানে থাকবে না। তাদের আর দেখতে পাব না আমি। যাদের পাব তাদের প্রাণভরে ভালোবাসব।

যারা নেই কিন্তু একদিন ছিল, তাদের গল্প আমি শোনাব ওদের।

সেই ছেলেটির গল্প। বুকে মাইন বেঁধে যে ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিংবা, সেই বুড়ো কৃষক। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে যে মৃদু হেসে বলেছিল, চললাম। আর ফিরে আসেনি। অথবা উদ্বাস্তু শিবিরের পাঁচলক্ষ মৃত শিশু।

দশহাজার গ্রামের আনাচে কানাচে এককোটি মৃতদেহ।

না এককোটি নয়, হয়তো হিসেবের অঙ্ক তখন তিনকোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে।

একহাজার এক রাত কেটে যাবে হয়তো। আমার গল্প তবু ফুরাবে না।

সামনে ধানক্ষেত। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। গ্রামের নাম রোহনপুর। ওখানে এসে ঘাঁটি পেতেছে ওরা, একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল।

ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই।

খাতাটা ক্যাম্প-কমান্ডারের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কার লেখা, আপনার।

না। আমাদের সঙ্গের একজন মুক্তিযোদ্ধার।

তার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি? আবার প্রশ্ন করলাম।

উত্তর দিতে গিয়ে মুহূর্ত-কয়েক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, দিন কয়েক আগে একটা অপারেশনে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়েছে সে।

তারপর?

তারপরের খবর ঠিক বলতে পাচ্ছিনা। হয়তো মেরে ফেলেছে। বেঁচেও থাকতে পারে হয়তো।

চোখজোড়া অজান্তে আবার খাতাটার ওপরে নেমে এল। অনেকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলাম সেটা। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম বাইরের দিকে।

বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। সেখানে আগুন জ্বলছে।

একটি জিজ্ঞাসা

হজে গেলে কিতা অয় বাবজান?

প্রশ্নটা আকস্মিক, তাই মেয়ের দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল করমআলী। কিন্তু কিছুই বলল না সে, নীরবে ধানের চারাগুলি পরিষ্কার করতে লাগল দু-হাতে।

হজে গেলে কিতা অয় বাবজান?

আবার প্রশ্ন। জবাব দিল না করমআলী। তাকালও না এবার।

হজে গেলে কিতা অয় বাবজান? কণ্ঠস্বরে আরো তাগিদ, আরও ব্যস্ততা।

তোর মাথা অয় হারামজাদী, কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঘামের ফোঁটাগুলিকে বাঁ-হাতের তালু দিয়ে মুছে ফেলে মুখ বিকৃত করল করমআলী।

কৌতূহলী ছোট্ট মেয়েটি বাবার এ অর্থহীন রাগের ভয়ে চুপসে গেল। অভিমানে চোখ দুটো ওর ছলছল করে উঠল পানিতে । উপুড় হয়ে চারাগুলো বাছাই করতে ব্যস্ত থাকে করমআলী, অনেকক্ষণ পর কী মনে করে মেয়ের দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল সে। 'আলের' উপর গুটিশুটি হয়ে বসে আছে মেয়েটি শীর্ণ হাতদুটোকে কোলের ওপর জড়ো করে। কচি মুখখানায় অভিমানের ভার। বড় করুণা হল করমআলীর। নিজের অসংযত ক্রোধের জন্য মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে।

'কিরে মুন্না? মুখ বড় বেজার দেহি যে। হজে যাইবার ইচ্ছা অইছে বুঝি।' যথাসম্ভব স্বরটাকে কোমলতর করতে চেষ্টা করল করমআলী।

আশ্বাস পেয়ে নড়েচড়ে বসল মেয়েটি। হজে গেলে কিতা অয় বাবজান?

পুরনো প্রশ্ন, এবার দ্বিরুক্তি করল না করমআলী। সানন্দে উত্তর দিল, হজে গেলে গুনাহ্ খাতাহ্ সব মাপ অইয়া যায়, বুঝলি বেটি?

উত্তর শেষে আবার কাজে মন দিল করমআলী। এখনো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে তার, সেগুলো আজকেই শেষ করতে হবে। বর্ষার মওসুম। বলা যায় না কখন কী হয়।

গুনা কারে কয় বাবজান? অদম্য কৌতূহলী মেয়ে।

একটা বড় আগাছার মূলকে সাবধানে মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে-ফেলতে করমআলী জবাব দিল, গুনাহ্ অইল গুনা, মানি খোদার হুকুম না মাইনলে, নামাজ না পড়লে, রোজা না রাখলে, সুদ খাইলে, চুরি ডাকাতি করলে গুনা অয়, বুঝলি?

গুনা অইলে কী অয় বাবজান?

তোর মাথা অয় হারামজাদী—আবার মুখ বিকৃত করল করমআলী। মেয়েটাকে বাড়িতে মায়ের কাছে রেখে এলে ভালো হত। ভীষণ পাজি মেয়ে—দেখছে এখন কথা বলার ফুরসৎ নেই, তবুও এমনি বকবক করবে।

কিন্তু তবুও উত্তর দিতে হল করমআলীকে। গুনাহ্ অইলে দোজখে যায় দোজখে।

দোজখের নাম শুনে চোখ বড় বড় করে বাবার দিকে তাকাল মেয়েটি। জ্র কুঁচকিয়ে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করল, দোজখ কারে কয় বাবজান?

এ আবার আরেক ফ্যাসাদ, না-শোনার ভান করে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল করমআলী। একটা ছোট মেয়ের সাথে আর কাঁহাতক বকবক করা যায়। বিশেষ করে যখন কথা বলার একটুও ফুরসৎ নেই তার।

দোজখ কারে কয় বাবজান?

কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল করমআলীর। বিরক্তিভরে দাঁতে দাঁত চাপল সে।

জোরে একটা চড় বসিয়ে দেবে নাকি মেয়েটির গালে।

আগাছার গোছাটা একপাশে ফেলে দিয়ে এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল করমআলী।

রক্তিম চোখে মেয়ের দিকে তাকাল এক পলক।

দোজখ হইল দোজখ। যেইহানে সারা দিনরাইত আগুন জ্বলে। সাপবিচ্ছু গিজগিজ করে, আর মানুষের লাঠির বাড়িতে তুলাপেজা বানাইয়া ফেলায়।

দোজখের বীভৎস চিত্রের কথা শুনে ভয়ে গুটিশুটি হয়ে বসল মেয়েটি। এপাশে ওপাশে বারকয়েক ফিরে ফিরে তাকাল সে। গাটা কেমন ছমছম করে উঠল ওর এই দিন-দুপুরেই।

বেহেস্ত বড় সুন্দর জায়গা না বাবজান?

'হু'—আগাছাগুলোকে আলের উপর তুলে রাখতে রাখতে মৃদুস্বরে উত্তর দিল করমআলী। পাটের দড়ি দিয়ে আগাছার আটিটাকে কষে বাঁধল সে।

তারপর মেয়ের হাত ধরে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগল জোর পায়ে। কোলে উঠবি? মাঝপথে এসে জিজ্ঞেস করল করমআলী। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল মেয়েটি।

তুমি হজে যাইবানা বাবজান?

উত্তর শেষে পাল্টা প্রশ্ন করল সে, অকস্মাৎ।

মেয়ের এ অদ্ভুত প্রশ্নে না-হেসে পারল না করমআলী।

আমি কিয়ের লাইগা যামু হজে। আমার উপর কি হজ ফরজ হইছে নাকি পাগলী। যাগো বহুত টাহা তারা যাইবো। ওগো হজে যাওন ফরজ করছে আল্লায়।

হজে গেলে গুনাহ খাতাহ্ সব মাপ অইয়া যায়, না বাবজান? বাবার মুখের দিকে আর একবার তাকাল মেয়েটি।

অনেকক্ষণ একটি কথাও বেরুল না তার মুখ দিয়ে। একটা প্রশ্নও করল না সে। চুপ করে কী যেন ভাবল। গভীরভাবে ভাবল সে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, অপ্রত্যাশিত ভাবেই বলে উঠল, যাগো টাহা আছে তারা গুনা করলেও বেহেস্তে যাইবো, না বাবজান?

দ্রুত মেয়ের দিকে চোখ নামিয়ে আনল করমআলী। একবার হাসতেও পারল না সে, রাগ করতেও না। শুধু ভাবতে লাগল গভীরভাবে।

হারানো বলয়

অফিস থেকে বেরুতেই ফুটপাতে দেখা হয়ে গেল মেয়েটির সাথে। একটুও চমকাল না আলম। যদিও ক্লান্ত চোখ দুটি ওর বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আরে আলম না। তুমি এখানে? মেয়েটিও ভুল করেনি, ঠিক চিনতে পেরেছে তাকে। অনেক দিন পরে দেখা হল, না? আবার বলল মেয়েটি।

হ্যাঁ বছর দুয়েক। সেই—

সেই ভৈরব স্টেশনে দেখা হবার পর এই প্রথম।

হ্যাঁ—এই প্রথম।

এবার ভালো করে ওর দিকে দৃষ্টি মেলে তাকাল আলম। আগের মতো ঠিক তেমনটিই আছে আরজু। তবুও মনে হল যেন অনেক বদলে গেছে ও। চোখের কোণে কালি জমেছে। হাসির ঔজ্জ্বল্যে ভাটা পড়েছে এখন।

তারপর, কী করছ আজকাল? আবার প্রশ্ন করল আরজু।

কী আর করব—কেরানিগিরি। উত্তর দিল আলম। তুমি কী করছ?

আমি? ম্লান হাসল আরজু। একটা কিছু করি আর কী।

তারপর—একপ্রস্থ নীরবতা। রাস্তার পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চলল ওরা। ধীর মন্থর পদক্ষেপ। আলম বলল, এসো চা খাওয়া যাক এককাপ করে। আপত্তি করল না আরজু। আলমের পিছুপিছু ঢুকল স্টলে।

অর্ডার পেয়ে টেবিলে চা রেখে গেল বয়। আর.....সেই মুহূর্তে একটি দিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল আলমের।

আজকের মতো এমনি মুখোমুখি হয়েই বসেছিল ওরা। আলম আর আরজু। কলেজের সামনে, কাফে হাউসের নির্জন কোণে। টেবিলে চায়ের পেয়ালা রেখে গেল বয়, অন্য দিনের মতো। আর আরজুর প্রশান্ত চোখ দুটোতে নেমে এল তৃপ্তির ঘন ছায়া। মুখোমুখি বসে দুজনা—অপরিসীম আনন্দঘন মুহূর্ত। কিন্তু......ঠিক যেন একখণ্ড ঝড়ো মেঘের মতোই সেখানে এসে দাঁড়াল মুনির, আরজুর বড় ভাই। রক্তিম চোখ দুটোতে আগুনের ফুলকি ঝরছিল মুনিরের। প্রেম-ট্রেমে বিশ্বাস করি না আমি। মুনির ধমক দিল আরজুকে—ওসব ছেলেমানুষি ছেড়ে দে। চাকরি করে ছোট ভাইবোনগুলোকে মানুষ করতে হবে তোকে তা ভুলে যাসনে।

লোকটাকে মাঝে মাঝে বড় বিরক্তিকর ঠেকত আলমের। তবুও কেন জানি শ্রদ্ধায় মাথাটা নুয়ে আসত ওর ব্যক্তিত্বের কাছে।

কী চুপ করে রইলে যে! কী ভাবছ? আরজুর সরল কণ্ঠস্বরে অতীতের আলম আবার ফিরে এল বর্তমানে।

কই না তো। কিছুক্ষণ আমতা আমতা করল সে। তারপর বলল—হ্যাঁ আরজু, মুনির ভাই কেমন আছেন? কী করছেন তিনি আজকাল?

মুখখানা বড় ফ্যাকাশে হয়ে গেল আরজুর—মুনির ভায়ের কথা বলছ? জানো না বুঝি? উনি এখন জেলে আছেন।

জেলে? অবাক না হয়ে পারল না আলম। কেন? কী করেছিলেন তিনি?

আরজু গম্ভীর হল। তারপর ম্লান হাসল একটু। জানিনে, ওরাতো কারণ জানায়নি।

নিরাপত্তা বন্দি?

হ্যাঁ।

কিন্তু কিসের অপরাধে?

জানিনে—চুপ করো। হঠাৎ আলমের হাতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল আরজু। তারপর আবার চুপচাপ। একটানা নীরবতা। চায়ের বিলটা চুকিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। আলম ভাবল আরজু বিয়ে করেছে কিনা একবার জিজ্ঞেস করলে হয়। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল.....কিন্তু থাক সে কথা। ও আবার কী মনে করে বসবে কে জানে।

কিছুক্ষণ পরে আরজুই প্রশ্ন করল তাকে। বিয়ে করেছ?

বিয়ে? না। তুমি?

আমি? তথৈবচ। হাসতে চেষ্টা করল আরজু। সে হাসি বড় করুণ ঠেকল আলমের। কিন্তু দেখ আরজু। তুমি তো প্রায়ই বলতে, বিয়ে করে একটা সুন্দর ফুটফুটে ছেলের মা হয়ে সংসার বাঁধাই নারীর ধর্ম। বলতে না তুমি?

ঘাড় বাঁকা করে তাকাল আলম আরজুর দিকে। মুখখানা তখন দেখবার মতো আরজুর। কিন্তু কথার মোড় ঘুরিয়ে নিল আরজু।

এই দেখ, রাত যে আটটা বেজে নয়টা হতে চলল। খেয়ালই নেই। চলি এবার। বাসায় ছোট বোনটার অসুখ। ওকে নিয়ে আবার রাত জাগতে হবে।

কার অসুখ বললে? আসকারির? আলমের প্রশ্নে আবার দাঁড়াতে হল আরজুকে।

হ্যাঁ—আসকারির। আরজু বলল।

কী রোগ?

মরণ রোগ। গলার স্বরটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠল আরজুর। কিছু টাকা পেলে একটা ভালো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করতাম ওর। জানি, ভালো হবার নয় ও রোগ। তবুও মন বোঝে না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আরজু। তারপর আবার বলল, জানো আলম। ওর মুখের দিকে তাকালে বড্ড মায়া লাগে। ভীষণ কষ্ট হয়। কেমন করুণ চোখ মেলে ও তাকায় আমাদের দিকে। এ বয়সে কেইবা মরতে চায় বলো। কথা শেষ হতে মাথার কাপড়টা অল্প একটু টেনে দিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে সরু পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আরজু। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আলম। তারপর ভাবল। মানুষ কত সহজেই না বদলে যেতে পারে।

কলেজ জীবনে সে দেখেছে আরজুকে। আর সেখানেই তো আরজুর সাথে প্রথম পরিচয় আলমের। গোলগাল মুখের ওপর টিকলো নাক, তারি গোড়ায় ছোট একটা তিল, ভাসা-ভাসা দুটি চোখ, শ্যামলা রং, দোহারা গড়ন। সরু পাড়ের শাড়ির সাথে হাতকাটা ব্লাউজ আর প্লেন বাটা স্যান্ডেল পরে কলেজে আসত ও। দেখতে বেশ মানাত ওকে। মুখের কোণে একটা স্নিগ্ধ হাসির রেখা লেগেই থাকত সব সময়। আর যখন শব্দ করে হাসত ও। তখন আরো সুন্দর, আরো লাবণ্যময়ী মনে হত ওকে।

অলঙ্কার পরার একটা প্রবল ঝোঁক ছিল ওর। সেবার স্কলারশিপের টাকাগুলো হাতে আসতেই আলমকে বলল, চল সরকারের দোকানে যাব একটু। পুরনো চুড়ি আছে দুটো। ভালো লাগে না আর—সেকেলে সেকেলে দেখতে। ওগুলো বিক্রি করে নতুন প্যাটার্নের একজোড়া কিনে আনব।

ছোট পাথর-সেটের একজোড়া বালা। দেখেই পছন্দ করল আরজু। বলল—কী সুন্দর দেখ! কিনব এগুলো। কিনে হাতে নিয়ে বলল, দাও পরিয়ে দাও তুমি আমার হাতে। ওর হাতটাকে মুঠোর ভেতর চেপে ধরে, চুড়িগুলো পরিয়ে দিল আলম। বাইরে বেরিয়ে এসে বলল আরজু, এগুলো কেন কিনলাম জানো? যদি কোনোদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কিংবা যদি একটা গাঢ় অন্ধকারের ভেতরে ডুবে যাই আমরা, তখন এ সুন্দর চকচকে পাথরগুলো আলোর সৃষ্টি করে পথ দেখাবে আমাদের। অন্ধকারে হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে না।

আরজুর ভাবালুতায় সেদিন যত অবাক হয়েছিল আলম, তার চাইতে আরো বেশি অবাক হল তার বছর তিনেক পরে, ভৈরব স্টেশনে আরজুর সাথে হঠাৎ দেখা হতে। হাত দুটো খালি আরজুর। বালা নেই। সুটকেসে তুলে রেখেছ বুঝি? হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল আলম।

কী বলছ ? বোকা বোকা চাহনি আরজুর।

হাত দুটো খালি দেখছি। সন্ন্যাসব্রত নিলে নাকি? কথাটা এবার ঘুরিয়ে বললেও বুঝল আরজু! কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর মুখখানা। ম্লান হেসে বলল, বিক্রি করে দিয়েছি ওগুলো, উপায় ছিল না। যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে সে, বাবা মারা গেলেন। তাঁর অসংখ্য দেনা। কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করতেন তিনি। সে টাকা পরিশোধ করতে হল। চোখের কোণে দুফোঁটা জল মুক্তোর মতো চকচক করছিল আরজুর। আর তারই কথা চিন্তা করতে করতে মেসে যখন ফিরে এল আলম, রাত তখন এগারোটা।

সেদিনের রেশ কাটতে-না-কাটতেই হপ্তা-দুয়েক পরে আবার দেখা হয়ে গেল আরজুর সাথে আলমের। অফিস-ফেরত পথে। চোখাচোখি হতে আজ আর হাসল না আরজু। উদ্‌ভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ওর দিকে। বোবা চাহনি।

কী ব্যাপার! আসছ কোত্থেকে? আলম প্রশ্ন করল। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আরজু, তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বলল। গোরস্থান থেকে।

গোরস্থান?

হ্যাঁ। আসকারি মারা গেছে।

মারা গেছে, কখন? অস্বাভাবিক গলায় বিড়বিড় করে উঠল আলম।

পরশু সকালে। মৃদু গলায় বলল আরজু। মরবার ঘণ্টা কয়েক আগে আমার গলা জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না আসকারির। আমায় মরতে দিসনে আপা! আমার ভীষণ ভয় করে। স্বরে ভাঙন ধরল আরজুর—ও থামল।

সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পেল না আলম। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না সে। কাঁটার মতো আটকে গেল গলার ভেতর।

তুমি এমন কাঁপছ কেন আরজু? শরীর ভালো নেই? এতক্ষণে স্বরটা বেরিয়ে এল আলমের।

মাটির দিকে চুপ করে চেয়ে রইল আরজু। কী যেন ভাবল। তারপর একসময় মুখ তুলল আলমের দিকে, কেন কাঁপছি জানো? দুটো দিন, একমুঠো ভাতও খেতে পাইনি আমি, শুধু আমি নই—আমার ছোট ছোট ভাইবোন, আমার বুড়ো মা কেউ খায়নি। সবাই উপোস। নির্জন রাস্তায় ছোট্ট শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আরজু।

কিন্তু এ মুহূর্তে কী করতে পারে আলম? কোম্পানি অফিসের একজন সামান্য কেরানি বই তো সে আর কিছুই নয়। মাস-শেষের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে পকেট তার গড়ের মাঠ। ওকে ভাবনা থেকে রেহাই দিল আরজু নিজেই। ভেজা-কণ্ঠে বলল—জেল থেকে চিঠি পেয়েছি একখানা মুনির ভায়ের। ওঁরও শরীর বিশেষ ভালো নয়। আমাশয় ভুগছেন। তবুও লিখেছেন—চিন্তা করিসনে তোরা, ভালো হয়ে যাব। তোদের কথা মনে পড়লে দুঃখ হয় খুব—বড় কষ্ট হচ্ছে তোদের নারে? কিন্তু কী করব বল্। ......তারপরেই সেন্সরবোর্ডের কালি লেপা। পড়া যায়নি কিছু। কথা শেষ করল আরজু।

মেসে ফিরে সে রাত আর ঘুমোতে পারল না আলম। বারবার উঠাবসা করল বিছানার উপর। পাশের সিটের রহমান সাহেব বিরক্তিবোধ করলেন বোধ হয়। তাই বললেন, এমন করছেন কেন সাহেব। খাওয়া হয়নি বুঝি আজকে? শুনলাম মেসের ম্যানেজার ডাইট বন্ধ করে দিয়েছে আপনার?

কোনো উত্তর দিল না আলম। এ তো একটা বহু প্রাচীন কথা। কী উত্তর দেবে? উত্তর এল ওপাশের খলিল সাহেবের কাছ থেকে। আমার ডাইটও বন্ধ করে দিয়েছে সাহেব। কিন্তু উপোস থাকবার হাত থেকে বড় জোর বেঁচে গেছি। ফুপাতো ভাই একটা থাকে শরৎদাস লেনে। ওর কাছে গিয়ে মুখ ফুটে চেয়ে খেয়ে এলাম একপেট। কী আর করা যায়। মাসের এ শেষ ক'টি দিন বড় একঘেয়ে দিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর এ একঘেয়ে দিন কটিও কেটে গেল পর পর। নতুন মাস। বকেয়া মাসের পাওনা টাকাগুলো হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল আলম। আজকের মধ্যেই শেষ হবে এগুলো—দেনা পরিশোধ করতে করতে। বাড়িতে মায়ের কাপড় নেই লিখেছে। ওঁর জন্য কাপড় কিনতে হবে একখানা। ছোট ভাইবোনগুলোর জন্য কয়েকটা ফ্রক, প্যান্ট। বারো

বছরের আফিয়াটার জন্য একটা কাপড় না পাঠালেই নয়। মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠল আলমের। টাকা হাতে নিয়েও বেশ ঘামিয়ে উঠছে সে। অন্ধকার—চারদিকে যেন অন্ধকার।

হঠাৎ আরজুর কথা মনে পড়ে গেল তার। যদি পথের ভেতর দেখা হয়ে যায় ওর সাথে! আর ও যদি আজ হাত পেতে বসে আলমের কাছে—তাহলে? চলার গতিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিল আলম। কিন্তু একটুপরেই থমকে দাঁড়াতে হল তাকে রাস্তার মোড়ে। একটা বিরাট ভিড় জমেছে সেখানে।

দারুণ তেজি মেয়ে, সাহেব। পুলিশ ধরতে এল তো চট করে গালে ওর চড় বসিয়ে দিল একটা। এ-পাশের ভদ্রলোক ও-পাশের ভদ্রলোককে বলছিলেন কথাগুলো। কানে এল আলমের, তার সাথে একটা ঔৎসুক্যও এসে দানা বাঁধল মনের ভেতর।

ব্যাপার আবার কী সাহেব। ওরাতো বলল চুরির আসামি, দেখে কিন্তু মনে হল না। মুখে একটা ভদ্র-ভদ্র ছাপ মেয়েটার।

ভদ্র অভদ্র বাছবিচার ছেড়ে দিন সাহেব। সেদিন পুরনো হয়ে গেছে। এ-পাশে ও-পাশে জমাট-বাঁধা লোকের টুকরো-টুকরো কথা। ভিড় ঠেলে আরো একটু এগিয়ে গেল আলম। আবছা দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে। চারপাশে পুলিশের বেষ্টনী। মাটিতে ছড়িয়ে আছে কতকগুলো ছাপানো কাগজ।

আপত্তিকর প্রচারপত্র বিলি করছিল নাকি মেয়েটি। ধরা পড়েছে একটু আগে। পাশের লোকটা ফিসফিসিয়ে বলল কাকে। আরো কী যেন বলছিল সে। কানে গেল না আলমের। মাথাটা তখন ভীষণভাবে চক্কর দিয়ে উঠেছে ওর। চোখদুটো আরজুর শান্ত গম্ভীর মুখের ওপর একান্তভাবে নিবদ্ধ। বৈকালী সূর্যের রক্তিম আভা তির্যকভাবে গড়িয়ে পড়ছে আরজুর হাতের হাতকড়াটার ওপর, আর কেমন চক্‌চক্ করছে ওটা। যেন ওর হারানো বালা দুটো। হঠাৎ মনে পড়ল আলমের। আরজু বলেছিল—ওর বালা অন্ধকারে পথ দেখায়।

বাঁধ

আর কিছু নয়, গফরগাঁ থাইকা পীরসাহেবেরে নিয়া আস তোমরা। অনেক ভেবেচিন্তে বললেন রহিম সর্দার।

তাই করেন হুজুর, তাই করেন! একবাক্যে সায় দিল চাষীরা।

গফরগাঁ থেকে জবরদস্ত পীর মনোয়ার হাজিকেই নিয়ে আসবে ওরা। দেশজোড়া নাম মনোয়ার হাজির। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। মুমূর্ষু রোগীকেও এক ফুঁয়ে ভালো করেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে।

সেবার করিমগঞ্জে যখন ওলাবিবি এসে ঘরকে-ঘর উজাড় করে দিচ্ছিল তখনই এই মনোয়ার হাজিই রক্ষা করেছিলেন গাঁটাকে। সাধ্য কি ওলাবিবির মনোয়ার হাজির ফুঁয়ের সামনে দাঁড়ায়! দিন দুয়েকের মধ্যে তল্পিতল্পা নিয়ে পালিয়ে গেল ওলাবিবি দু-দশ গাঁ ছেড়ে। এমন ক্ষমতা রাখেন মনোয়ার হাজি।

গাঁয়ের লোক খুশি হয়ে অজস্র টাকাপয়সা আর অজস্র জিনিসপত্র ভেট দিয়েছিল তাঁকে।

কেউ দিয়েছিল বাগানের শাক-সবজি। কেউ দিয়েছিল পুকুরের মাছ। কেউ মোরগ হাঁস। আবার কেউ দিয়েছিল নগদ টাকা।

দুধের গরুও নাকি কয়েকটা পেয়েছিলেন তিনি। এত ভেট পেয়েছিলেন যে, সেগুলো বাড়ি নিতে নাকি তিন-তিনটে গরুর গাড়ি লেগেছিল তাঁর।

সেই সৌভাগ্যবান পীর মনোয়ার হাজি! তাঁকেই আনবে বলে ঠিক করল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, চাষী আর ক্ষেতমজুররা।

কিন্তু পীরকে আনতে হলে টাকার দরকার। পীর সাহেব কি এমনি আসবেন? তাঁর জন্যে বিশেষ ধরনের পাল্‌কি চাই। আট বাহকের পাল্‌কি। ঘি ছাড়া কোনো কিছু মুখেই রোচে না পীর সাহেবের। গোস্ত ছাড়া ভাত খান না। খাবার শেষে একপ্রস্থ মিষ্টি না হলে খাওয়াটাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তাঁর। তাই টাকার দরকার।

টাকার চিন্তা করলে তো চলবে না। যেমন কইরা হোক পীর সাহেবেরে আনতে হইবো। কোমর খিঁচে বললে জমির ব্যাপারী। পর পর দুইডা বছর ফসল নষ্ট অইয়া গেল, খোদা না করুক, এবার যদি কিছু অয়, তাইলে যে কোনোমতেই জান বাঁচান যাইবে না। শেষের দিকে কান্নায় ভিজে এল জমির ব্যাপারীর কণ্ঠস্বর।

পর পর কত বছর বন্যার জলে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে ওদের। ভরা বর্ষার শুরু-হতেই বাঁধটা ভেঙে যায় আর হড়হড় করে পানি এসে ভাসিয়ে দিয়ে যায় সমস্ত প্রান্তরটাকে।

কপাল চাপড়িয়ে খোদাকে অনেক ডেকেছে ওরা। অনেক কাকুতি-মিনতি ভরা প্রার্থনা জানিয়েছে খোদার দরবারে। কিছুতেই কিছু হয়নি। খোদা কান দেননি ওদের প্রার্থনায়!

নীরব থেকেছেন তিনি। নীরব থাকবো না? খোদা কি আর যার-তার ডাকে সাড়া দেয়! গাঁয়ের লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করল জমির মুন্সি। খোদার ওলিদের দিয়া ডাকাইলে পর খোদা শুনবো। মন টলবো। তাই কর, পীর সাইবেরে নিয়া আস তোমরা।

ঠিক হল বাড়ি-বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলবে ওরা। অবশ্য চাঁদা সবাই দেবে। দেবে না কেন? বান ডাকলে তো আর একা রহিম সর্দারের ফসল নষ্ট হবে না, হবে সবার। সবার ঘরেই অভাব-অনটন দেখা দেবে। সবাই দুঃখ ভোগ করবে। ধুঁকে ধুঁকে মরবে, যেমন মরেছে গত দু-বছর।

কিন্তু মতি মাস্টার যুক্তি-তার্কর ধার ধারে না। চাঁদা চাইতেই রেগে বললে, চাঁদা দিমু? কিসের লাইগা দিমু? ওই লোকডার পিছে ব্যয় করবার লাইগা?

মতি মাস্টারের কথায় দাঁতে জিভ কাটল জমির মুন্সি।

তওবা, তওবা। কহেন কি মাস্টার সাব? খোদাভক্ত পীর, আল্লার ওলি মানুষ। দশ গাঁয়ে যারে মানে, তার নামে এত বড় কুৎসা।

ভালা কাজ করলা না মাস্টার, ভালা কাজ করলা না। ঘন ঘন মাথা নাড়লেন জমির ব্যাপারী। পীরের বদদোয়ায় ছাই অইয়া যাইবা!

কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল মতি মাস্টার। কী যে কও চাচা, তোমাগো কথা শুনলে হাসি পায়।

হাসি পাইবো না, লেখাপড়া শিখা তো এহন বড়মানুষ অইয়া গেছ। মুখ ভেংচিয়ে বললেন জমির ব্যাপারী। চাঁদা দিলে দিবা, না দিলে নাই, এত বাহাত্তরী কথা ক্যান?

কিন্তু, বাহাত্তরী কথা আরো একজনের কাছ থেকে শুনতে হল তাদের।

শোনাল দৌলত কাজির মেজ ছেলে রশিদ। শহরে থেকে কলেজে পড়ে। ছুটিতে বাড়িতে এসেছে বেড়াতে। চাঁদা তোলার ইতিবৃত্ত শুনে সে বলল, পাগল আর কী, পীর আইনা বন্যা রুখবো! এ একটা কথা অইল?

কথা নয় হারামজাদা! জমির মুন্সি কোনো জবাব দেবার আগেই গর্জে উঠলেন দৌলত কাজি নিজে। আল্লাহর ওলি, পীর দরবেশ, ইচ্ছা করলে সবকিছু করতে পারে। সবকিছু করতে পারে তাঁরা। এই বলে নূহ নবী আর মহাপ্লাবনের ইতিকথাটা ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন তিনি।

খবরটা রহিম সর্দারের কানে যেতে দেরি হল না। দু-দশ গাঁয়ের মাতব্বর রহিম সর্দার। পঞ্চাশ বিঘে খাস আবাদি জমির মালিক। একবার রাগলে, সে রাগ সহজে পড়ে না তাঁর। জমির মুন্সির কাছ থেকে কথাটা শুনে রাগে থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি, এ্যাঁ! খোদার পীর নিয়া ঠাট্টাতামাশা। আচ্ছা, মতি মাস্টারের মাস্টারি আমি দেইখা নিমু। দেইখা নিমু মইত্যা এ গেরামে কেমন কইরা থাহে। অত্যন্ত রেগে গেলেও একেবারে হুঁশ হারাননি রহিম সর্দার। কাজির ছেলে রশিদের নামটা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন তিনি। কাজিবাড়ি কুটুম্ববাড়ি, বেয়াই-বেয়াই সম্পর্ক, তাই।

পীর সাহেবের নুরানি সুরত দেখে গাঁয়ে ছেলে-বুড়োরা অবাক হল। আহা! এমন যার সুরত, গুণ তার কত বড়, কে জানে। ভক্তি সহকারে পীর সাহেবের পায়ের ধুলো নিল সবাই। গরিব মানুষ হুজুর! মইরা গেলাম, বাঁচান। হুজুরের পা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন জমির ব্যাপারী।

জমির ব্যাপারী বোকা নন। বোঝেন সব। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। পীর সাহেবের মন গলালে এ হতভাগাদের জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি। তারপরেই না খোদা মুখ তুলে তাকাবেন ওদের দিকে।

পীর সাহেব এসে পৌঁছলেন সকালে। আর ঘটা করে বৃষ্টি নামল বিকেলে।

বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সারাটা বিকেল বৃষ্টি হল। সারারাত চলল তার একটানা ঝপঝপ ঝনঝন শব্দ। সকালেও তার বিরাম নেই।

প্রতিবছর এ সময়ে শ্রাবণমাসের 'ডাত্তর'। কেউ কেউ বলে, বুড়োবুড়ির 'ডাত্তর'। এই ডাত্তরের আয়ুষ্কাল পনের দিন। এই পনের দিন একটানা ঝড়বৃষ্টি হবে। জোরে বাতাস বইবে। বাতাস যদি বেশি থাকে আর অমাবস্যা কি পূর্ণিমার জোয়ারের যদি নাগাল পায়, তাহলে সর্বনাশ! নির্ঘাত বন্যা!

খোদা, রক্ষা কর! রক্ষা কর খোদা! রহম কর এই অধমগুলোর ওপর! কান্নায় ভেঙে পড়লেন জমির ব্যাপারী। মনে মনে মানত করলেন। যদি ফসল নষ্ট না হয় তাহলে হালের গরুজোড়া পীর সাহেবকে ভেট দিবেন তিনি।

গম্ভীর পীর সাহেব ঢুলে ঢুলে তছবি পড়েন আর খোদার মহিমা বর্ণনা করেন সবার কাছে। খোদার মহিমা বর্ণনা শেষ হলে পীর সাহেবের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য আজগুবি ঘটনার অবতারণা করেন তাঁর সাকরেদরা।

মনে আশা জাগে চাষীদের। আনন্দে চকচক্ করে ওঠে কোটরে-ঢোকা চোখগুলো। ভিড়ের মাঝ থেকে গনি মোল্লা ফিসফিসিয়ে বললেন, কই নাই মনার পো? এই পীর যেই সেই পীর নয়, খোদার খাস পীর!

কথাটা মিনু পাটারীর কানে যেতে গদগদ হয়ে বলল সে, শুন নাই তোমরা? সেইবার এক বাঁজা মাইয়া পোলারে এক তাবিজে পোয়াতি বানাইয়া দিছলেন তিনি। শুন নাই?

যারা শুনেছে তারা মাথা নেড়ে সায় দিল, হ্যাঁ কথাটা সত্যি। আর যারা শোনেনি তারাও সেইমুহূর্তে বিশ্বাস করল কথাটা। পীর সাহেব সব পারেন। ইচ্ছে করলে এই ঝড়-বৃষ্টিটাকে এইমুহূর্তে থামিয়ে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু থামাচ্ছেন না প্রয়োজনবোধে থামাবেন তাই।

কিন্তু, মতি মাস্টার বিশ্বাস করল না কথাটা। হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, ঝড় থামাবে ওই বুড়োটি! মন্তর পড়ে ঝড় থামাবে?

হ্যাঁ থামাবে। আলবত থামাবে। আকাশভেদী হুংকার ছাড়লেন গনি মোল্লা। চোখ রাঙিয়ে ফতোয়া দিলেন। এই নাফরমান বেদীনগুলো গাঁয়ে আছে দেইখাই তো গাঁয়ের এই দুরবস্থা।

হ্যাঁ, ঠিক কইছ মোল্লার পো। তাঁকে সমর্থক করলেন বুড়ো তিনজী মিঞা। এই কাফেরগুলারে গাঁ থাইকা না তাড়াইলে গাঁয়ের শান্তি নাই।

কিন্তু গাঁয়ের শান্তি রক্ষার চাইতে 'ঢল' রোখাটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রকৃতি উন্মাদ হয়ে পড়েছে। ক্ষুব্ধ বাতাস বারবার সাবধান করছে। ঢল হইবো ঢল। পানি-ভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনজী মিঞা। রক্ত দিয়ে বোনা সোনার ফসল।

হায়রে ফসল!

হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠেন তিনি, খোদা।

মসজিদে আজান পড়ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে। এস মিলাদ পড়তে এস। এস মঙ্গলের জন্য এস।

টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে বৃষ্টির ভেতরে ভিজে-ভিজেই মসজিদের দিকে ছুট দিলেন জমির ব্যাপারী। যাবার সময় ঘরের বৌ-ঝিদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, এ রাত ঘুমাইবার রাত নয়। বুঝলা? অজু কইরা বইসা খোদারে ডাকো।

অজুটা সেরে উঠে দাঁড়াতেই কার একটা হাত এসে পড়লে ছকু মুন্সির কাঁধের ওপর। জমির মুন্সির ছেলে ছকু মুন্সি। গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান মানুষ। প্রথমটায় ভয়ে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল, কে?

ভয় নাই আমি মতি মাস্টার।

ব্যাপার কী? এ রাত্তির বেলা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ছকু।

মতি মাস্টার বলল, যাও কনহানে?

যাই মসজিদে। ছকু জবাব দিল। ক্যান তোমরা যাইবা না?

না। স্বল্প থেমে মতি মাস্টার বলল। এক কাজ কর্ ছকু। মসজিদে যাওয়া এহন রাখ্। ঘর থাইকা কোদাল নিয়া বাইর অইয়া আয়। যা জলদি কর।

কোদাল দিয়া কী অইবো? রীতিমতো ঘাবড়ে গেল ছকু মুন্সি।

যা ছকা। কোদাল আন। পেছন থেকে বলল মন্তু শেখ।

এতক্ষণে পুরো দলটার দিকে চোখ পড়ল ছকু মুন্সির। একজন, দুজন নয়, অনেক। অন্তত জন পঞ্চাশেক হবে। সবার হাতে কোদাল আর ঝুড়ি।

মতি মাস্টার এত লোক জোটাল কেমন করে? কাজির বাড়ির পড়ুয়া ছেলে রশিদকে দলের মধ্যে দেখে আরো একটু অবাক হল ছকু।

ব্যাপারটা অনেক দূর আঁচ করতে পারল সে। গতকাল এ নিয়েই কাজিপাড়ায় বুড়ো কাজির সঙ্গে তর্ক করছিল মতি মাস্টার। গত কয়েকবছর কি খোদারে ডাকেন নাই আপনারা? হ্যাঁ, ডাকছিলেন। কিন্তু ফল কী হয়েছে? ফসল কি বাঁচছে আপনাগো? বাঁচে নাই। তাই কইতে আসলাম কেবল বইসা খোদারে ডাকলে চলব না। এ কয়টা গাঁয়ে মানুষ তো আমরা কম না। সবাই মিলে বাঁধটারে যদি পাহারা দিই, সাধ্য কি বাঁধ ভাঙে?

মতি মাস্টারের কথা শুনে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিলেন বুড়ো কাজি। অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছিলেন তাকে। সে কাল বিকেলের কথা। মসজিদে আজান হচ্ছে। পীর সাহেব ডাকছে সবাইকে, এস মিলাদ পড়তে এস। এস মঙ্গলের জন্য এস।

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ছকু। তারপর টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়াল সে। খপ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরল রশিদ, ছকু।

এই ছকা। খেপে উঠল পণ্ডিতবাড়ির চাঁদু।

অগত্যা, কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল ছকু মুন্সি।

মাইলখানেক হাঁটতে হবে ওদের। তারপর বাঁধ।

নবীন কবিরাজের পুকুরপাড়ে এসে পৌঁছতেই জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল একটা।

ভয়ে আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়াল ওরা। খোদা সাবধান করছে তাদের। খবরদার যাইও না।

যাইও না মাস্টার। থামো, থামো! হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ছকু মুন্সি। খোদা নারাজ হইবো, মসজিদে চল সবাই।

ইস, চুপ কর ছকু। বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে মতি মাস্টার। এখন কথা কইবার সময় না। জলদি চল্।

আবার চলতে শুরু করল ওরা।

দূরে মসজিদ থেকে দরুদের শব্দ ভেসে আসছে। পীর সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দরূদ পড়ছে তিনজী মিঞা, জমির ব্যাপারী, রহিম সর্দার ও আরো কয়েকশ জোয়ান-জোয়ান মানুষ। অসহায়ের মতো ঊর্ধ্বে হাত তুলে চিৎকার করছে তারা। হে আসমান জমিনের মালিক! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা! হে রহমানের রহিম! তুমিই সব! তুমি রক্ষা কর আমাদের।

ওদিকে মরিয়া হয়ে কোদাল চালাচ্ছে মতি মাস্টারের দল। এ বাঁধ ভাঙতে দেবে না তারা। কিছুতেই না।

তাদের সোনার ফসল ডুবতে দেবে না তারা। কখনই না।

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে বাজ পড়ছে। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে। খরস্রোতা নদী ফুলে ভেঙে পড়বে।

হায় খোদা। ঘরের বৌ-ঝিয়েরা করুণ আর্তনাদ করে ফরিয়াদ জানায় আকাশের দিকে চেয়ে। দুনিয়াতে ইমান বলে কিছু নেই, তাই তো খোদা রাগ করেছেন। মানুষ গরু সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি। ধ্বংস করে দেবেন এই পৃথিবীটাকে, পাপে ভরা এই পৃথিবী।

দুরু দুরু বুক কাঁপছে তিনজী মিঞার। চোখের জলে ভাসছেন জমির ব্যাপারী। আর দুলে দুলে তছবি পড়ছেন।

হায়রে ফসল!

সোনার ফসল!

এ ফসল নষ্ট হতে পারে না! টর্চ হাতে ছুটোছুটি করছে মতি মাস্টার। কোদাল চালাও! আরো জোরে!

বাঁধে ফাটল ধরেছে!

এ ফাটল বন্ধ করতেই হবে।

অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কোদাল চালাচ্ছে ওরা।

মন্তু শেখ চিৎকার করে বলল, আলির নাম নাও ভাইরা, আলির নাম নাও।

আলির নামে কাম হইবো শেখের পো? বললে বুড়ো কেরামত।

তারচে একডা গান গাও। গায়ে জোশ আইবো।

মন্তুশেখ গান ধরল।

গানের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ বাজ পড়ল একটা কাছে কোথাও।

কোদাল চালাতে চালাতে মতি মাস্টারকে আর তার চৌদ্দপুরুষকে মনে মনে গাল দিতে লাগল ছকু মুন্সি, খোদার সঙ্গে লাঠালাঠি। হা-খোদা, এই কী জমানা আইছে। খোদা, এই অধমের কোনো দোষ নাই। এই অধমেরে মাপ কইরা দিও।

ঝুড়ি মাথায় বিড়বিড় করে উঠল পণ্ডিতবাড়ির চাঁদু, হাত-পা গুটাইয়া মসজিদে বইসা বইসা ঢল রুখবো না আমার মাথা রুখবো।

তারপর হঠাৎ একসময়ে মতি মাস্টারের গলার শব্দ শোনা গেল, আর ভয় নাই চাঁদু। আর ভয় নাই। এবার তোরা একটু জিরাইয়া নে! এতক্ষণে হাসি ফুটল সবার মুখে। শ্রান্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁধের ওপর এলিয়ে পড়ল অবশ দেহগুলো। পঞ্চাশটি ক্লান্ত মানুষ। সূর্য তখন পুব আকাশে উঁকি মারছে।

আধো আলো অন্ধকার আকাশ বেয়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাসের তালে তালে নাচছে সোনালি ফসল। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল জমির বেপারী। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

খুশিতে চক্‌চক্ করে উঠল জমির মুন্সির চোখ দুটো। দৌড়ে এসে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খেলেন গনি মোল্লা। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

একমুহূর্তে যেন চাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁ-টা। ছেলে-বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে ধেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে। ঘুম চোখে তখনও ঢুলছেন পীর সাহেব। স্বল্প হেসে বললেন, খোদার কুদরতের শান কে বলতে পারে।

সাগরেদরা সমস্বরে বলে উঠল, সারারাত না ঘুমাইয়া খোদারে ডাকছেন আমাগো পীর সাব। বাঁধ ভাঙে সাধ্য কী?

পীর সাহেব তখনো হাসছেন। স্বল্প পরিমিত হাসি আপেলের রক্তিমাভার মতো ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে মুখের সর্বত্র।

সূর্যগ্রহণ

সকাল থেকেই মেঘ মেঘ করছিল সারা আকাশটা।

দুপুর গড়াতেই বৃষ্টি নামল জোরে।

বাইরে শুধু বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বাড়ছিল। আবার কমছিল। রাস্তায় পায়েচলা পথিকের সাড়া শব্দ ছিল না। শুধু দূর রেস্তোরাঁ। থেকে ভেসে আসছিল গানের টুকরো টুকরো কলি। অস্পষ্ট তার সুর। তবু, বেশ লাগছিল তাঁর।

আধপোড়া বিড়িটায় আগুন ধরিয়ে, ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন আনোয়ার সাহেব।

সবেমাত্র ফিরেছেন অফিস থেকে।

একটু পরেই আবার বেরুতে হবে। বাইরে। টিউশনির টাকাগুলো আজ পাবার কথা। আজ দেবেন কাল দেবেন করে অনেক ভুগিয়েছেন ভদ্রলোক। এদিকে টাকার ভীষণ দরকার আনোয়ার সাহেবের। পাওনাদাররা তাড়া দিচ্ছে সকাল বিকেল। তার ওপর... হঠাৎ কড়া নড়ে উঠল জোরে। বাবু চিঠি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে আধভাঙা চশমাটা ধীরে নাকের ডগায় বসিয়ে দিলেন আনোয়ার সাহেব।

হাসিনার চিঠি।

অতিপরিচিত একটা সম্বোধনের পর লিখেছে—

ওগো! এমন করে আর কতদিন দূরে ঠেলে রাখবে আমায়। আজ পুরো একটি বছর হতে চলল প্রায়, বাড়ি আসনি তুমি। একবারটির জন্যেও তোমায় দেখিনি এ একটি বছর। আগে, বছরে কতবার আসতে তুমি। মনে আছে, সেবার খুব ঘন ঘন এসেছিলে। মা বলছিলেন— কিরে তমু। এবার যে খুব তাড়াতাড়ি এলি। অফিস বন্ধ নাকি?

মায়ের প্রশ্নটা মৃদু হেসে এড়িয়ে গিয়েছিলে তুমি। রাতের বেলা আমার কানে কানে বলেছিলে, কেন এত ঘন ঘন আসি জানো?

কেন?

তোমায় বারবার দেখতে ইচ্ছে করে, তাই।

হুঁ। মিথ্যে কথা।

কে বলল তোমায় মিথ্যে। বলে আমার চিবুকে আলতো নাড়া দিয়েছিলে তুমি।

কিন্তু, সেই তুমি আজ এমন হয়ে গেছ কেন? একি তোমার অভিমান, না আর কিছু। কিন্তু কেনই বা তুমি অভিমান করবে। আমি তো কোনো অন্যায় করেছি বলে মনে হয়

না। আর যদি করেই থাকি, তুমি কি ক্ষমা করে দিতে পার না আমায়। ওগো তোমাকে কেমন করে বোঝাই কত কষ্টে দিন কাটে আমার।

এখানে এসে হঠাৎ থামলেন আনোয়ার সাহেব। যদিও চিঠিটা শেষ হয়নি এখনও। এখনও অনেক-অনেক কিছু লেখা আছে তার ভেতর। তবু থামলেন তিনি। কেননা ইতিমধ্যেই মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠেছে তাঁর। কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম জমেছে এসে।

চিঠিটা টেবিলের ওপর বইচাপা দিয়ে রেখে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন আনোয়ার সাহেব। কলগোড়ায় গিয়ে চোখেমুখে পানি দিলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার ফিরে এলেন ঘরে।

কী মনে করে হঠাৎ বাক্স থেকে পুরনো চিঠিগুলোকে একে একে বের করলেন আনোয়ার সাহেব। গত একবছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক—অনেক লিখেছে।

কিন্তু কেন লিখেছে?

কার কাছে লিখেছে হাসিনা?

আনোয়ার সাহেবের কাছে?

না-না আনোয়ার সাহেবের কাছে লিখবে কেন সে। আনোয়ার সাহেব তো কেউ নন তার।

যদিও সব। তবুও কেউ নন।

হায়রে! হাসিনা যদি জানত!

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে আনোয়ার সাহেবের। চিঠিগুলোকে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ পুরনো একখানা চিঠির ওপর আলতো চোখ বুলাতে থাকেন তিনি।

টাকা পেয়েছি। মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক'টি পাঠিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে কর তাহলে আর বলার কিছুই নেই আমার।

যাক, মানু এখন সব-সময়, 'বাবা বাবা' বলে ডাকে। যে-বাবাকে জন্মের পর থেকে একবারটির জন্যেও দেখেনি। সে বাবার নামটাকেই প্রথম উচ্চারণ করেছে সে। কী আশ্চর্য দেখ তো।

পুরনো চিঠিটাকে খামের ভেতর পুরে রেখে আবার নতুন চিঠিটা হাতে তুলে নেয় আনোয়ার সাহেব।

মানুর জন্য মনটা কেমন কেঁদে ওঠে তাঁর। আহা! মেয়েটাকে যদি একবার দেখতে পেতেন তিনি। কেমন হয়েছে মেয়েটা? সে কি দেখতে ঠিক তার বাবার মতোই হয়েছে?

মানুর কথা ভাবতে গিয়ে আর একটা মুখের আদল ভেসে উঠল আনোয়ার সাহেবের চোখের ওপর—সুন্দর গোলগাল একখানা মুখ। প্রশস্ত কপালের ওপর তেলবিহীন উস্কখুস্ক চুল। মুখভরা খোঁচাখোঁচা দাড়ি, হপ্তায় মাত্র একবার শেইভ করত তসলীম।

আনোয়ার সাহেব বকতেন খুব। এ আবার কেমন স্বভাব বল তো। দাড়ি রাখতে হলে রীতিমতো রেখে দিও। যদি মুখটাকে ন্যাড়া রাখবারই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলে রোজ একবার করে শেইভ করো। এমন মুখভরা খোঁচাখোঁচা দাড়ি—একটা সৌন্দর্যজ্ঞান থাকাও তো দরকার।

বকুনি খেয়ে এরপর কিছুদিন ঠিকমতো দাড়ি কামাত তসলীম। চুলে তেলও লাগাত বেশ পরিপাটি করে।

তারপর আবার সেই অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আনোয়ার সাহেব বলতেন। আচ্ছা তসলীম, তোমার এ স্বভাবের জন্য বৌয়ের কাছ থেকে বকুনি খাও না তুমি?

আর বকুনি। কথাই বলে না বৌ। বলে মৃদু হাসত তসলীম। বড় লাজুক মেয়ে কিনা তাই। তারপর একটু চুপ থেকে আবার বলত। কবিরা এ রকম একটু-আধটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ই আনোয়ার সাহেব। এ শুধু আমার বেলা নয়। কবিদের একটা স্বভাবধর্ম।

তসলীম কবিতা লিখত। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওটাই ছিল ওর একমাত্র নেশা। আনোয়ার সাহেব ছিলেন ওর কবিতার প্রথম শ্রোতা আর প্রথম সমালোচক। শুনতে না চাইলেও জোর করে শোনাত তসলীম। তবু না শুনলে ক্ষুণ্ণ হত সে। মাঝে মাঝে, অভিমানে কথা বলাই বন্ধ করে দিত সে। মানে ভাঙাতে আনোয়ার সাহেবের কর্ম সাবাড়। দেখো তসলীম। আমায় শুনিয়ে কী লাভ বল তো। আমি কি কবি, না সাহিত্যিক। আমি কী বুঝব তোমার ও কবিতার। তুমিই বল।

মুখ টিপে হাসত তসলীম। আলবত বুঝবেন। বুঝবেন না কেন? একটু চুপ থেকে আবার বলত সে। পড়ব, শুনবেন?

পড় না, শুনি। বলতেন আনোয়ার সাহেব।

হাত নেড়ে নেড়ে পড়ত তসলীম। পড়ত না ঠিক যেন অভিনয় করত সে।

পড়া শেষ হলে যদি বলতেন, ভালো হয়েছে। তাহলে খুব খুশি হত তসলীম। আর যদি বলতেন, কেমন যেন ভালো লাগল না আমার। তাহলে মুখ কালো করে বলত সে, কবিতা বোঝেনই না আপনি।

আনোয়ার সাহেব হাসতেন। কিছু বলতেন না।

কিন্তু আজ দীর্ঘ একবছর পর হঠাৎ হাসিনার চিঠি হাতে নিয়ে তসলীমের কথা মনে পড়ল কেন আনোয়ার সাহেবের?

না। আজ বলে নয়। প্রতিদিন, যখনি হাসিনার চিঠি এসেছে তখনই তসলীমকে মনে পড়েছে আনোয়ার সাহেবের। বড্ড বেশি করে মনে পড়েছে যেন। রোগা লিকলিকে ছেলেটার কথা বারবার করে চোখের ওপর ভেসে উঠেছে তাঁর।

বড্ড বেশি কথা বলতে পারত তসলীম। যতক্ষণ ঘরে থাকত, ঘরটাকে সরগরম রাখত সে।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে অশান্ত পদক্ষেপে তসলীমকে ঘরময় পায়চারি করতে দেখে প্রথমটায় কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন আনোয়ার সাহেব। কী ব্যাপার তসলীম। পাগলের মতো এমন ছুটোছুটি করছ কেন। কী হয়েছে?

কেন। আপনি কিছুই শোনেননি? উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিল তসলীম। ঘাড় নেড়েছিলেন আনোয়ার সাহেব। কই না তো। কেন কী হয়েছে?

গুলি। গুলি করেছে সাহেব। আর কী হয়েছে। ইউনিভার্সিটির ছেলে আর একটাও বেঁচে নেই। গিয়ে দেখে আসুন।

সে-কী ! যেন আকাশ থেকে পড়েছেন আনোয়ার সাহেব।

খুব যে অবাক হচ্ছেন। বানিয়ে বলছি নাকি? গিয়ে একবার দেখে আসুন না। মেডিক্যাল কলেজের সামনে একহাঁটু রক্ত জমেছে। বিবেক-বিরুদ্ধ যে-কোনো কথাকেই বাড়িয়ে বলা তসলীমের স্বভাব ছিল। কিন্তু তসলীম মিছে কথা বলত না কোনোদিন।

তাই সবকিছু বিশ্বাস না হলেও গুলি চলার খবরটা যে সত্য তা বিশ্বাস না করে পারেননি আনোয়ার সাহেব।

গুলি সত্যই চলেছিল!

কিন্তু, সে গুলি যে তার পরদিন তসলীমের বুকেও এসে বিঁধবে তা কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন আনোয়ার সাহেব?

উহ্! আজ দীর্ঘ একবছর পর তসলীমের কথাটা মনে না পড়লেই ভালো হত।

কথাটা ভীষণ ধরেছে আনোয়ার সাহেবের। টেবিলের ওপর হাসিনার পুরনো চিঠিগুলোর দিকে একবার তাকালেন। এ একবছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক—অনেক লিখেছে।

বাড়ি না-আসার কী কারণ থাকতে পারে তোমার? আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, নাহয় আমার ওপর রাগ করেছ তুমি। কিন্তু তোমার নবজাত শিশু, সে তো কোনো অপরাধ করেনি। তাকে দেখবার জন্যেও কি একবার বাড়ি আসতে পার না তুমি?

মিনুর বিয়ের বয়স হয়েছে। তার বিয়েশাদির বন্দোবস্ত একটা করতে হবে বই কী। মা-তো তোমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন। তুমি ছাড়া পরিবারে আর কেই বা আছে যে তার বিয়েশাদির বন্দোবস্ত করবে?

চিঠিটা মুড়ে আবার খামের ভেতর রেখে দিলেন আনোয়ার সাহেব। দু-হাতের তালুতে মুখ গুঁজে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একটা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে মনের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

না-না, মানু-মিনু সবাইকে ভুলে যেতে চান তিনি। ভুলে যেতে চান হাসিনাকে। আম্মাকে। সবাইকে। গোটা পরিবারটাকে। তবু, ভুলতে পারেন কই আনোয়ার সাহেব? যত ভাবেন সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে দেবেন। তখন মনের ভেতর আরো বেশি করে শিকড় গাড়ছে ওরা। সারাদিন ওদের কথাই শুধু ভাবেন আনোয়ার সাহেব।

উহ্ এ-প্রহসন আর কতদিন চালাবেন তিনি!

স্মৃতিপটে আবার উঁকি মারছে তসলীম। তসলীম! তসলীমের রক্তাক্ত দেহ।

কিন্তু, দেহের কথাটা নিছক কল্পনাই করছেন আনোয়ার সাহেব। গুলিবিদ্ধ তসলীমের রক্তাক্ত দেহটা দেখেননি তিনি। দেখেননি বলে তো একটা গভীর সন্দেহে আজো মন তোলপাড় করছে তাঁর! সত্যিই কি মরেছে তসলীম?

একুশের সারারাত একমুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি সে। বসে বসে পোস্টার লিখেছে, অসংখ্য পোস্টার।

পরদিন সকালে যখন বাইরে বেরুচ্ছিল তখন নিষেধ করেছিলেন আনোয়ার সাহেব। আজ তোমার বাইরে বেরোন ঠিক হবে না তসলীম। যা মেজাজ তোমার! কী করতে কী করে বসবে ঠিক নেই। তার চাইতে ঘরে বসে বসে ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লিখো। সেটাও একটা কাজ।

সে কথা শুনেও আমল দেয়নি তসলীম। বলেছে, আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখব কী দিয়ে? বলে বেরিয়ে গেছে সে। সেদিন আর ফেরেনি।

তার পরদিন।

তার পরদিনও না।

থানায় খোঁজ করে দেখেছেন আনোয়ার সাহেব। জেলগেটে খোঁজ করেছেন। খোঁজ করেছেন হাসপাতালে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি তাকে। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠেছে আনোয়ার সাহেবের। অশান্ত পদক্ষেপে, অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। শেষে তাঁর এক সহকারী বজলু সাহেবের কাছ থেকে শুনেছেন আসল খবরটা। হাইকোর্টের মোড়ে গুলি চলবার সময় তসলীমকে একবার দেখেছিলেন তিনি।

আর দেখেননি।

আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তসলীমের। তসলীম মারা গেছে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন আনোয়ার সাহেব। এ কী হল বজলু সাহেব। ওর বৌ পরিবারের কী হবে! ওদের যে কেউ নেই।

কেউ নেই! ধরা-গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন বজলু সাহেব।

না। কেউ নেই। বলেছিলেন আনোয়ার সাহেব। ওর বৌ, মা, বোন ওদের কী হবে বজলু সাহেব?

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে তাঁর কণ্ঠস্বর।

অনেকটা মাতালের মতো টলতে টলতে বাসায় ফিরে এসেছিলেন আনোয়ার সাহেব। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই নজরে পড়েছিল তাঁর। ডাকবাক্সে একখানা চিঠি। তসলীমের চিঠি। পরের চিঠি পড়ার অভ্যাস কোনোদিনও ছিল না আনোয়ার সাহেবের। কিন্তু, সেদিন পড়েছেন।

বহু পরিচিত একটা সম্বোধনের পর, গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি লেখা।

আজ ক'দিন থেকে মিনুর জ্বর। আমারও শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না। কানু শেখ তার পাওনা টাকার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছে। মাইনে পাওয়া মাত্র টাকা পাঠিয়ো। ঘরে চাল ডাল কিছুই নেই। এক বেলা আলু আর এক বেলা ভাত খাচ্ছি।

চিঠিটা পড়ে মনটা আরো বেশিরকম খারাপ হয়ে গিয়েছিল আনোয়ার সাহেবের। সারা রাত জেগে শুধু ভেবেছেন তিনি তসলীমের মৃত্যু-খবরটা কি জানাবেন হাসিনাকে? চিঠি লিখে কি জানিয়ে দেবেন ওদের—যে তসলীম মারা গেছে। ওদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম লোকটা আর বেঁচে নেই।

এ আঘাত কি সইতে পারবে ওরা?

মাথার ভেতরটা আবার গরম হয়ে উঠেছে আনোয়ার সাহেবের। সামনে টেবিলের ওপর রয়েছে হাসিনার চিঠিগুলো। এ ক'বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক—অনেক লিখেছে।

সামনে এখনও খোলা আছে ওর শেষ চিঠিখানা।

ওগো, আর কতদিন বাড়ি আসবে না তুমি? তুমি কি মাস মাস টাকা পাঠিয়েই শুধু নিশ্চিন্ত থাকবে? মা যে তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেল।

ওগো ....!

নয়া পত্তন

ভোরের ট্রেনে গাঁয়ে ফিরে এলেন শনু পণ্ডিত।

ন্যুব্জ দেহ, রুক্ষ চুল, মুখময় বার্ধক্যের জ্যামিতিক রেখা।

অনেক আশা-ভরসা নিয়েই শহরে গিয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, কিছু টাকাপয়সা সাহায্য পেলে আবার নতুন করে দাঁড় করাবেন স্কুলটাকে। আবার শুরু করবেন গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কাজ। কত আশা! আশার মুখে ছাই!

কেউ সাহায্য দিল না স্কুলটার জন্য। না চৌধুরীরা। না সরকার। সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে তো রীতিমতো ধমকই খেলেন শনু পণ্ডিত। শিক্ষা বিভাগের বড় সাহেব শমসের খান বললেন, রাজধানীতে দুটো নতুন হোটেল তুলে, আর সাহেবদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইংলিশ স্কুল দিতে গিয়ে প্রায় কুড়ি লাখ টাকার মতো খরচ। ফান্ডে এখন আধলা পয়সা নেই সাহেব। অযথা বারবার এসে জ্বালাতন করবেন না আমাদের। পকেটে যদি টাকা না থাকে, স্কুল বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকুন। এমনভাবে ধমকে উঠেছিলেন তিনি যেন স্কুলের জন্য সাহায্য চাইতে এসে ভারি অন্যায় করে ফেলেছেন শনু পণ্ডিত।

হেঁট মাথায় সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এলেও, একেবারে আশা হারাননি তিনি। ভেবেছিলেন সরকার সাহায্য দিল না, চৌধুরী সাহেব নিশ্চয়ই দেবেন। এককালে তো চৌধুরী সাহেবের সহযোগিতা পেয়েই না স্কুলটা দিয়েছিলেন শনু পণ্ডিত।

সে আজ বছর পঁচিশেক আগের কথা—

আশেপাশে দু-চার গাঁয়ে স্কুল বলতে কিছুই ছিল না।

লেখাপড়া কাকে বলে তা জানতই না গাঁয়ের লোক।

তখন সবেমাত্র এন্ট্রান্স পাশ করে বেরিয়েছেন শনু পণ্ডিত। বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে।

চৌধুরীর তখন যৌবনকাল। নতুন বিয়ে-করা বৌ নিয়ে গাঁয়েই থাকতেন তিনি। গাঁয়ে থেকে জমিদারির তদারক করতেন। বর্ষার মওসুমে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দক্ষিণের ঝিলে যেতেন বুনোহাঁস আর কালো বক মারতে। অবসর সময় তাস, পাশা আর দাবা খেলতেন বসে বসে। কথায় কথায় গাঁয়ে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠার ইচ্ছেটা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন শনু পণ্ডিত। জুলু চৌধুরীও বেশ আগ্রহ দেখালেন। বললেন, সে তো বড় ভালো কথা, গাঁয়ের লোকগুলো সব গণ্ডমূর্খ রয়ে যাচ্ছে। একটা স্কুল দিয়ে যদি ওদের লেখাপড়া শেখাতে পারো সে তো বড় ভালো কথা। কাজ শুরু করে দাও।

টাকাপয়সা খুব বেশি না দিলেও, স্কুলের জন্য একটা অনাবাদী জমি ছেড়ে দিয়েছিলেন জুলু চৌধুরী। শহর থেকে ছুতোর মিস্ত্রি এসে গুটিকয়েক ছোট ছোট টুল আর টেবিলও তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি।

একমাত্র সম্বল দু-টুকরো ধেনো জমি ছিল শনু পণ্ডিতের। সে দুটো বিক্রি করে, স্কুলের জন্য টিন, কাঠ আর বেড়া তৈরির বাঁশ কিনেছিলেন তিনি।

ব্যয়ের পরিমাণটা তাঁরই বেশি ছিল, তবু চৌধুরীর নামেই স্কুলটার নামকরণ করেছিলেন তিনি—জুলু চৌধুরীর স্কুল। আটহাত কাঠের মাথায় পেরেক-আঁটা চারকোণী ফলকের ওপর জুলু চৌধুরীর নামটা জ্বলজ্বল করত সকাল, বিকেল।

আজো করে।

যদিও আকস্মিক ঝড়ে মাটিতে মুখ থুবরে ভেঙে পড়েছে স্কুলটা। আর তার টিনগুলো জং ধরে অকেজো হয়ে গেছে বয়সের বার্ধক্য হেতু।

স্কুলটা ভেঙে পড়েছে। সেটা আবার নতুন করে তুলতে হলে অনেক টাকার দরকার। শনু পণ্ডিত ভেবেছিলেন, সরকার সাহায্য দিল না, জুলু চৌধুরী নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু ভুল ভাঙল।

সাহায্যের নামে রীতিমতো আঁতকে উঠলেন জুলু চৌধুরী। বললেন, পাগল, টাকাপয়সার কথা মুখেও এনো না কখনো। দেখছ না কত বড় স্টাব্লিশমেন্ট। চালাতে গিয়ে রেগুলার হাঁসফাঁস হয়ে যাচ্ছি। আধলা পয়লা নেই হাতে। এদিক দিয়ে আসছে, ওদিক দিয়ে যাচ্ছে।

শনু পণ্ডিত বুঝলেন, গাঁয়ের ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখুক, তা আর চান না চৌধুরী সাহেব।

কেউই চান না।

না চৌধুরী, না সরকার, কেউ না।

অগত্যা গাঁয়ে ফিরে এলেন শনু পণ্ডিত।

ভেঙে পড়া স্কুলটার পাশ দিয়ে আসবার সময় দু-চোখে পানি উপচে পড়ছিল শনু পণ্ডিতের। লুঙ্গির খুঁটে চোখের পানিটা মুছে নিলেন। গাঁয়ের লোকগুলো উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল তাঁর অপেক্ষায়। ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করল, কী পণ্ডিত, টাকা-পয়সা কিছু দিল চৌধুরী সাহেব?

না, গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন শনু পণ্ডিত। চৌধুরীর আশা ছাইড়া দাও মিয়ারা। এক পয়সাও আর পাইবা না তার কাছ থাইকা। সেই আশা ছাইড়া দাও।

পণ্ডিতের কথা শুনে কেমন ম্লান হয়ে গেল উপস্থিত লোকগুলো। বুড়ো হাশমত বলল, আমাগো ছেইলাপেইলাগুলা বুঝি মূর্খ থাইকবো?

তা, আর কী কইরবার আছে কও। আমিতো আমার সাধ্যমতো করছি? আস্তে বলল শনু পণ্ডিত।

বুড়ো হাশমত বলল, তুমি আর কী কইরবা পণ্ডিত। তুমি তো এমনেও বহুত কইরছ। বিয়া কর নাই, শাদি কর নাই। সারাজীবনটাই তো কাটাইছ ওই স্কুলের পিছনে। তুমি আর কী কইরবা।

দুপুরের তপ্ত রোদে তখন খাঁ খাঁ করছিল মাঠ ঘাট, প্রান্তর। দূরে খাসাড়ের মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল কোনো রাখাল ছেলে। বাতাসে বেগ ছিল না। আকাশটা মেঘশূন্য।

সবাইকে চুপচাপ দেখে আমিন বেপারী বলল, আর রাইখা দাও লেখাপড়া। আমাগো বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষে কোনোদিন লেখাপড়া করে নাই। ক্ষেতের কাজ কইরা খাইছে। আমাগো ছেইলাপেইলারাও তাই কইরবো। লেখাপড়ার দরকার নাই।

তা মন্দ কও নাই বেপারী। তাকে সমর্থন জানাল মুন্সি আক্রম হাজি। লেখাপড়ার কোনো দরকার নাই। আমাগো বাপ-দাদায় লেখাপড়া কারে কয় জাইনতোও না।

বাপ-দাদায় জাইনতোও না দেইখা বুঝি আমাগো ছেইলাপেইলাগুলাও কিছু জাইনবো না। ইতা কিতা কও মিয়া। তকু শেখ রুখে উঠল ওদের ওপর।

শনু পণ্ডিত বলল, আগের জমানা চইলা গেছে মিয়া। এই জমানা অইছে লেখাপড়ার জমানা। লেখাপড়া না জাইনলে এই জমানায় মানুষের কদর অয় না।

তা—তোমরা কি কেবল কথা কইবা না কিছু কইরবা। জোয়ান ছেলে তোরাব আলী অধৈর্য হয়ে পড়ল। বলল, চৌধুরীরা তো কিছু দিবো না তা বুঝাই গেল। আর গরমেন্টো—গরমেন্টোর কথা রাইখা দাও। গরমেন্টোও মইরা গেছে। এহন কী কইরবা, একডা কিছু কর।

হুঁ। কী কইরবা কর। চিন্তা কর মিয়ারা। বিড়বিড় করে বলল শনু পণ্ডিত। বুড়ো হাশমত চুপচাপ কী যেন ভাবছিল এতক্ষণ। ছেলে দুটো আর বাচ্চা নাতিটাকে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে স্কুলে দিয়েছিল সে। আশা ছিল আর কিছু না হোক লেখাপড়া শিখে অন্তত কাচারির পিয়ন হতে পারবে ওরা। গভীরভাবে হয়তো তাদের কথাই ভাবছিল সে। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলল, যতসব ইয়ে অইছে—যাও ইস্কুল আমরাই দিমু। কারো পরোয়া করি না। না গরমেন্টো। না চৌধুরী, বলে কোমরে গামছা আঁটল হাশমত।

বুড়ো হাশমতকে কোমরে গামছা আঁটতে দেখে জোয়ান ছেলে তোরাব আলীও লাফিয়ে উঠল। বলল, টিনের ছাদ যদি না দিবার পারি অন্তত ছনের ছাদ তো দিবার পারমু একডা। কি মিয়ারা?

হ-হ ঠিক। ঠিক কথাই কইছ আলির পো। গুঞ্জরণ উঠল চারদিকে।

হাশমত বলল, মোক্ষম প্রস্তাব। ছনের ছাদই দিমু আমরা। ছনের ছাদ দিতে কয় আঁটি ছন লাইগবো? কী পণ্ডিত, চুপ কইরা রইলা ক্যান। কও না?

কমপক্ষে তিরিশটা লাইগবো। মুখে মুখে হিসেব করে দিল শনু পণ্ডিত। তকু বলল, ঘাবড়াইবার কি আছে, আমি তিনডা দিমু তোমাগোরে।

আমি দুইডা দিমু পণ্ডিত। আমারডাও লিস্টি কর। এগিয়ে এসে বলল কদম আলী।

তোরাব বলল, আমার কাছে ছন নাই। ছন দিবার পারমু না আমি। আমি বাঁশ দিমু গোটা সাত কুড়ি। বাঁশও তো সাত-আট কুড়ির কম লাইগবো না।

হ-হ ঠিক ঠিক। সবাই সায় দিল ওর কথায়।

দু-দিনের মধ্যে যোগাড়যন্ত্র সব শেষ।

বাঁশ এল, ছন এল। তার সাথে বেতও এল বাঁশ আর ছন বাঁধবার জন্য।.

আয়োজন দেখে আনন্দে বুকটা নেচে উঠল শনু পণ্ডিতের। এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবছিল আমিন বেপারী। সবার যাতে নজরে পড়ে এমন একটা জায়গায় বসে গলা খাঁকরিয়ে বলল সে, জিনিসপত্তরতো জোগাড় কইরাছ মিয়ারা। কিন্তুক যারা গতর খাইটবো তাগোরে পয়সা দিবো কে?

হাঁ, তাইতো। কথাটা যেন একমুহূর্তে নাড়া দিল সবাইকে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন শনু পণ্ডিত। এইডা বুঝি একটা কথা অইল। নিজের কাম নিজে করমু, পয়সা আবার কে দিবো? বলে বাঁশ কেটে চালা বাঁধতে শুরু করলেন তিনি। বললেন, নাও—নাও মিয়ারা শুরু কর।

হুঁ। শুরু কর মিয়ারা। বলল তকু শেখ।

স্কুলের খুঁটি তৈরির জন্য লম্বা একটা গাছকে খালপার থেকে টেনে নিয়ে এল তোরাব। হুঁ, টান মারো না মিয়ারা। টান মারো।

হু। মারো জোয়ান হেঁইয়ো—সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো। টান মারো। টান মারো।

আস্তে আস্তে। এত তড়বড় কোরলে অয়। বলল বুলির বাপ। হু।

কামের মানুষ হেঁইয়ো—আপনা কাম হেঁইয়ো। টান টান।

মরা চৌধুরী হেঁইয়ো। চৌধুরীর লাশ হেঁইয়ো। হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠল তোরাব আর তকু।

হাসল সবাই।

খক্‌খক্ করে কেশে নিয়ে বুড়ো হাশমত বলল, মরা গরমেন্টো কইলানা মিয়ারা? মরা গরমেন্টো কইলা না?

হুঁ। মরা গরমেন্টো হেঁইয়ো। —গরমেন্টোর লাশ হেঁইয়ো। টান টান। করম মাঝি চুপ করেছিল এতক্ষণ। বলল, ফুর্তিছে কাম কর মিয়া। আমি সিন্নি পাকাইবার বন্দোবস্ত করিগা।

বাহ্‌বা মাঝির পো—বাহ্‌বা। চালাও ফুর্তি। কলকণ্ঠে চিৎকার উঠল চারদিক থেকে।

পাটারী বাড়ির রোগা লিকলিকে বুড়ো কাদের বক্সটাও এসে জুটেছে সেখানে। তাকে দেখে আমিন বেপারী ভ্রূ কোঁচকাল। কী বক্স আলী। সিন্নির গন্ধে ধাইয়া আইছ বুঝি? ক'দিনের উপাস?

যত দিনের অই ; তোমার তাতে কী? বেপারীর কথায় খেপে উঠল কাদের বক্স। এত দেমাক দেহাও ক্যান মিয়া। উপাস ক্যাডা না থাকে? তুমিও থাক। সক্কলে থাকে।

ঠিক ঠিক। তকু সমর্থন করল তাকে। চৌধুরীরা ছাড়া আর সক্কলেই এক-আধ বেলা উপাস থাকে। এমন কোনো বাপের ব্যাটা নাই যে বুক থাবড়াইয়া কইবার পারবো—জীবনে একদিনও উপাস থাকে নাই—হ।

তকু আর কাদেরের কথায় চুপসে গেল আমিন বেপারী।

তোরাব বলল, কি মিয়ারা, কিতা নিয়া তর্ক কর তোমরা। বেড়াটা ধর। টান মার।

হুঁ। মারো জোয়ান হেঁইয়ো—চৌধুরীর লাশ হেঁইয়ো—মরা চৌধুরী হেঁইয়ো। আহহারে চৌধুরী রে! খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সবাই একসাথে।

আক্রম হাজি রুষ্ট হল ওদের ওপর। এত বাড়াবাড়ি ভালা না মিয়ারা। এত বাড়াবাড়ি ভালা না। এহনও চৌধুরীর জমি চাষ কইরা ভাত খাও। তারে নিয়া এত বাড়াবাড়ি ভালা না।

চাষ করি তো মাগনা চাষ করি নাকি মিয়া। তোরাব রেগে উঠল ওর কথায়। পাল্লায় মাইপা অর্ধেক ধান দিয়া দিই তারে।

পাক্কা অর্ধেক। বলল কাদের।

সন্ধ্যা নাগাদ তৈরি হয়ে গেল স্কুলটা।

শেষ বানটা দিয়ে চালার উপর থেকে নেমে এলেন শনু পণ্ডিত।

লম্বা স্কুলটার দিকে তাকাতে আনন্দে চিক্‌চিক্ করে উঠল কর্মক্লান্ত চোখগুলো।

সৃষ্টির আনন্দ।

বিড়ির টান মেরে কদম আলী বলল, গরমেন্টোরে আর চৌধুরীরে আইনা একবার দেখাইলে ভালা অইবো পণ্ডিত। তাগোরে ছাড়াও চইলবার পারি আমরা।

হ-হ। তাগোরে ছাড়াও চইলবার পারি। ঘাড় বাঁকাল শনু পণ্ডিত।

একটু দূরে সরে গিয়ে বটগাছের নিচে বসতেই কাঠের ফলকটার দিকে চোখ গেল তকু শেখের। আট-হাত লম্বা কাঠের ওপর পেরেক-আঁটা ফলক। তার ওপর জুলু চৌধুরীর নামটা জ্বলজ্বল করে সকাল বিকেল।

ওইটা আর এইহানে ক্যান? বলল তকু শেখ। ওইটারে ফালাইয়া দে! ফালাইয়া দে ওইটা।

ভাসাইয়া দে ওইটারে খালের ভিতর। তোরাব আলী বলল, ভাসাইয়া দে খালে ; চৌধুরী খালে ভাসুক। হঠাৎ কী মনে করে আবার নিষেধ করল তোরাব। থাম—থাম ফালাইস না। ইদিকে আন।

কালো চারকোণী ফলকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে একখানা দা দিয়ে ঘষে ঘষে চৌধুরীর নামটা তুলে ফেলল তোরাব আলী। তারপর বুড়ো হাশমতের কল্কে থেকে একটা কাঠকয়লা তুলে নিয়ে অপটু হাতে কী যেন লিখল সে ফলকটার ওপর।

শনু পণ্ডিত জিরোচ্ছিল বসে বসে। বলল, ওইহানে কী লেইখবার আছে আলীর পো। কিতা লেইখবার আছ ওইহানে?

পইড়া দেহ না পণ্ডিত, আহ পইড়্যা দেহ। আটহাত লম্বা কাঠের ওপর পেরেক-আঁটা ফলকটাকে যথাস্থানে গেঁড়ে দিল তোরাব।

অদূরে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে মৃদুস্বরে পড়লেন শনু পণ্ডিত। শনু পণ্ডিতের ইস্কুল। পড়েই বার্ধক্য-জর্জরিত মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তাঁর। বিড়বিড় করে বললেন, ইতা কিতা কইরাছ আলীর পো। ইতা কিতা কইরাছ?

ঠিক কইরাছে। একদম ঠিক। ফোকলা দাঁত বের করে মৃদু হাসল বুড়ো হাশমত।

লজ্জায় তখন মাথাটা আরো নুয়ে এসেছে শনু পণ্ডিতের।

মহামৃত্যু

লাশটাকে ধরাধরি করে উঠোন থেকে ঘরে নিয়ে এল ওরা।

তারপর আস্তে শুইয়ে দিল মেঝের ওপর।

বাইরে তখন সন্ধ্যার আস্তরণে রাত নেমে এসেছে ঘন হয়ে। শিয়রে দুটো মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে বক্রাকারে বসল ওরা, লাশটাকে ঘিরে। কারো মুখে কথা নেই, সবাই চুপচাপ।

কাঁপা হাতে ওর রক্তভেজা বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে আনল শমসের আলী। একখানা চিঠি, আর একখানা ফটো। কার ফটো ওটা? কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ গলিয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল রহমান, কার ফটো?

ওর ভাবী বধূর, আস্তে করে বলল শমশের আলী, এ মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল ওর, আসছে বৈশাখে—।

ওটা রেখে দাও, ওর বুকপকেটেই রেখে দাও ওটা। কে যেন বলল আশ্চর্য মৃদু গলায়।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পাড়ায়। আর দল বেঁধে ওকে দেখতে আসছিল সবাই। দোরগোড়ায় জুতোগুলো নিঃশব্দে খুলে রেখে ভেতরে ঢুকেছিল ওরা, যেন দেবদর্শনে এসেছে।

দুটো মেয়ে এসে নীরবে বসল ওর পায়ের কাছে।

আর একজন বসল শিয়রের পাশে।

বুড়ো সুরেন উকিলের ছোট মেয়েটা হঠাৎ তার কনে আঙুলটা কেটে একটা রক্ততিলক বসিয়ে দিল ওর পাণ্ডুর কপালে।

বাকি দুজনা পরম স্নেহভরে চুলের প্রান্ত দিয়ে মুছে দিল ওর পায়ের ধুলোগুলো। আর সবাই নির্বাক নিস্পন্দ।

ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে মৃদু-মৃদু। ক্ষয়ে-আসা মোমবাতি দুটোর জায়গায় আরো দুটো মোমবাতি জ্বেলে দিল শমসের আলী।

বুড়ো সগির মিয়া ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়ে গেল রহমানকে।

কবর দেবার কোনো বন্দোবস্ত কিছু হয়েছে?

হচ্ছে।

গোরস্তানে কখন নিয়ে যাবে ওকে?

ভোরে।

কাপড়চোপড় কেনা হয়েছে?

না।

তবে, এই নাও, টাকা নাও, কাপড় কেনার জন্য পকেট থেকে পাঁচটে টাকার বের করে দিল সগির মিয়া।

সুরেন উকিল দিল আরও পাঁচটে টাকা।

ঝগড়াটে পল্টুর মা, হাড়কেপ্পন বলে যার পাড়াময় খ্যাতি, সেও দুটো টাকা গুঁজে দিল রহমানের হাতে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার ফজল শেখ উজাড় করে দিল ওর সারাদিনের পুরো রোজগারটা।

রহমান বলল, এত টাকা দিয়ে কী হবে?

ফজল শেখ বলল, ওর জন্য ভালো দেখে একটা কাপড় কিনো। দেখো, মিহি হয় যেন, বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এল ওর।

আর দেখো, আতর আর কর্পূর একটু বেশি পরিমাণে কেনা হয় যেন। চোখদুটো পানিতে ছলছল করে উঠল সগির মিয়ার। কিইবা সামর্থ্য আছে আমাদের। আমরা কিইবা করতে পারি ওর জন্য।

ঘর আর বাহির।

বাহির আর ঘর।

সারারাত একলহমার জন্যও ঘুমাল না ওরা।

ঘুম এল না ওদের, রাত জেগে বসে বসে হয়তো গত বিকেলটার কথাই ভাবছিল ওরা।

অস্তগামী সূর্যের তির্যক আভায় আকাশের সাদা টুকরো-টুকরো মেঘগুলো রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল তখন। কাঠের লম্বা বারান্দাটার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বুড়ি দাদী তার বারো বছরের নাতনীকে সে মেঘগুলো দেখাচ্ছিল আর বলছিল, ও মেঘগুলো লাল কেন জানো? ও-মা জানো না বুঝি? তা জানবে কেন। আজকালকার মেয়ে কিনা ; ধর্মকথাতো পড়ওনি; শোনও না। হোসেন কে চেনো? হজরত আলীর ছেলে হোসেন। এজিদ তাঁকে অন্যায়ভভাবে খুন করেছিল কারবালায়। বড় কষ্ট দিয়ে খুন করেছিল তাঁকে। সেই হোসেনের পাক রক্ত ; রোজ বিকেলে জমাট বেঁধে দেখা দেয় পশ্চিমাকাশে। বুঝলে?

নিচে, কলতলায় তখন পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল গুটি-আটেক মেয়েমানুষ। পল্টুর মা তার মোটাসোটা দেহটা দেখিয়ে বারবার শাসাচ্ছিল বাকি সবাইকে। আর আপনমনে বকবক করছিল একটানা।

দোতালার কোণের ঘরে অফিস-ফেরত বাবুরা তাস নিয়ে বসেছিল সবে। পাশের ঘরে টেকো মাথা রহমানটা রোগা লিকলিকে বৌটাকে মারছিল তখন। রোজ যেমনটি মারে।

সামনের বাড়ির বুড়ো উকিলের তন্বী মেয়েটা সেতারে ইমনকল্যাণের সুর ছড়াচ্ছিল মৃদু মৃদু।

বেশ কাটছিল বিকেলটা।

রোজ যেমনটি কাটে।

ছেদ পড়ল অকস্মাৎ।

পশ্চিমমুখো লম্বা দোতালা বাড়ির বাসিন্দাদের চমকে দিয়ে সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল একটা লোক। পেছনে আরো তিনজন। কাকে যেন ধরাধরি করে এনে নিঃশব্দে উঠোনে নামিয়ে রাখল ওরা।

পাংশু মুখ ; বাকহীন।

কলগোড়ায় যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাই আর্তনাদ করে উঠল সবার আগে। আ-হা-হা কার ছেলেগো! কার ছেলে এমন করে খুন হল! আ-হা-হা কার ছেলেগো!

কোন্ মায়ের বুক খালি হল গো। কার ছেলে খুন হল!

ঝগড়াটে পল্টুর মা এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এল সামনে। কেমন করে মরল গো ছেলেটা ; অাঁ? কেমন করে মরল?

লোকগুলো তখনো চুপচাপ।

দোতালায় যারা ছিল তারাও ততক্ষণে নেমে এসেছে নিচে।

মৃত লোকটাকে ঘিরে তখন একটা ছোটখাটো জটলা বেঁধে গেছে উঠোনে।

রক্তাক্ত মৃতদেহটার ওপর ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ চাপা আর্তনাদ করে উঠল এল. ডি. ক্লার্ক শমসের আলী। হায় খোদা, এ কী করলে, এ যে আমাদের নূরুর ছেলে শহীদ। —কেমন করে মরল?

কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না লোকগুলো।

টেকো মাথা রহমান বলল, আরে—তাইতো এ যে দেখছি শহীদ।

আপনার রুমেইতো থাকত ও শমসের সাহেব। তাই না?

হাঁ, ও আমার রুমেই থাকত! আস্তে বলল শমসের আলী। তারপর আবার ওকে বয়ে-নিয়ে-আসা লোকগুলোর দিকে মুখ তুলে তাকাল সে! এ যে রক্তে চপচপ করছে ; কেমন করে মরল?

চারজন লোকের একজন গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল আস্তে। ফিরে এসে গলায় ফিসফিস করে কী যেন বলল সে সবাইকে।

সে কী? চাপা আর্তনাদ কান্নার মতো শোনা গেল। একসাথে আঁতকে উঠল দোতালা বাড়ির বাসিন্দারা। সে কী?

ট্যাক্সি-ড্রাইভার ফজল শেখ বলল, সে কী, কে গুলি করতে গেল ওকে। কেন গুলি করল?

আবার এজিদ নাজেল হল নাতো দুনিয়ার ওপর? বুড়ি দাদী বিড়বিড় করে উঠল।

তারপর এক সীমাহীন নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সবাই। ফ্যাকাশে বিবর্ণ চোখগুলো তুলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। তারপর, আবার তাকাল মাটিতে শোয়ানো রক্তলাল মৃতদেহটার দিকে।

কালো, মুখচোরা ছেলেটা বছরখানেকের ওপর থেকেই ছিল এ-বাড়িতে। থাকত। খেতো। কলেজে যেত।

কই, কোনোদিনও তো চোখে পড়েনি কারো।

পড়বেই বা কেমন করে। বাহাত্তর গেরস্তের বাড়িতে কত লোক আসে, কত লোক যায়। কে কার খোঁজ রাখে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সবসময়। কিন্তু, অকস্মাৎ আজ সবাই এক অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করল ওই ছেলেটার সাথে। বেদনার্ত চোখ তুলে সবাই তাকাল ওর দিকে।

সারারাত তাকাল ওরা।

ভোরে গরম পানিতে ওর লাশটাকে ধুইয়ে যখন খাটের ওপর শোয়ানো হল, তখন সারা উঠোনটা গিজগিজ করছে লোকে।

পাড়ার ছেলেরা একটা লম্বা বাঁশের ডগায় পতাকার মতো ঝুলিয়ে নিয়েছে ওর রক্তে ভেজা জামাটা। ওটা ওরা বয়ে নেবে শবযাত্রার পুরোভাগে। বুড়ো সগির মিয়া বলছিল, ওকে আমরা গোরস্তান পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। বড় রাস্তায় ট্রাক ভর্তি মিলিটারি আর পুলিশ দেখে এলাম। মাঝপথে হয়তো ছিনিয়ে নেবে ওরা।

আমরা দেব কেন? দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল ছেলেরা।

মা নেই, বাবা নেই, ভাই-বোন কেউ এখানে নেই ওর।

মা-বাবা হয়তো ভাবছেন ছেলে তাদের নিরাপদেই পড়ালেখা করছে এখন। গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ি আসবে। কোলের মানিক ফিরে আসবে কোলে।

শেষ দর্শনের জন্য মুখের বাঁধনটা খুলে দেয়া হল ওর।

পল্টুর মা, ঝুঁকে পড়ে চুমো খেল ওর কপালে। তারপর চোখে আঁচল চেপে সরে দাঁড়াল একপাশে।

বুড়ি দাদী বিড়বিড় করে বলল, হায় খোদা, এজিদের গুষ্ঠি বুঝি এখনও দুনিয়ার ওপর রেখে দিয়েছ তুমি! হায় খোদা!

আহা! মা যখন মউতের কথা শুনবে—তখন কী অবস্থা হবে মা'র! বলল আর একজন।

মৃতের খাটটা কাঁধে তোলা নিয়ে কাড়াকাড়ি হল কিছুক্ষণ।

ছেলেরা বলল, আমরা নেব।

বুড়োরা বলল, আমরা।

শেষে রফা হল। ঠিক হল মিনিট দশেকের বেশি কেউ রাখতে পারবে না। শ'খানেক লোক পাড়ার। সবাইকে সুযোগ দিতে হবে তো!।

খাটে শোয়ানো শহীদকে নিয়ে যখন রাস্তায় নামল ওরা, সূর্য তখন বেশ খানিকটা উঠে গেছে উপরে।

সবার সামনে, বাঁশের ডগায় ঝোলানো রক্তাক্ত জামা হাতে সুরেন উকিলের ছোট মেয়ে শিবানী। তার দু-পাশে হোসেন ডাক্তারের দুই নাতনী। রানু আর সুফিয়া। ওদের যেতে নিষেধ করছিল অনেকেই। তবু জিদ ধরেছে ওরা—ওরা যাবেই।

যাক। যেতে চাইছে যেখন যাক না, কি আছে। বলেছিলেন বুড়ো সগির মিয়া।

মিছিলটা যখন ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল সরু গলি বেয়ে।

আর গলির দু-পাশের জানালা, ছাদ আর বারান্দা থেকে মেয়েরা— মায়েরা দু-হাতে কোঁচড়-ভরা ফুল ছুড়ে মারছিল ওর খাটিয়া লক্ষ করে।

চামেলী। গোলাপ। রজনীগন্ধা।

ফুল আর গোলাপজল।

গোলাপজল আর ফুল।

ফুলে ফুলে আগাগোড়া ঢেকে গেল শহীদ। ফুলের নিচে ডুবে গেল ওর লাশটা। দোতালা বাড়ির সংকীর্ণ বারান্দা থেকে ফুলে ছুড়ে মারতে মারতে আশ্চর্য মৃদু গলায় কে যেন বলল, আমাদের ভাষাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিয়েছে ও।

আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে। বলল আর একজনা।

কথাটা কানে আসতেই বোধ হয়; অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল এল. ডি. ক্লার্ক শমসের আলী। দু চোখে অশ্রুর বান ডাকল ওর।

ছিঃ শমসের ভাই, কাঁদছ কেন। এ সময় কাঁদতে নেই। মৃদু তিরস্কার করল ওকে ফজল শেখ।

ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে শমসের আলী বলল, বড় হিংসে হচ্ছে— বড় হিংসে হচ্ছে ফজলুরে, আমি কেন ওর মতো মরতে পারলাম না।

ভাঙাচোরা

টুনুর স্বামীকে দেখে এমনভাবে চমকাতে হবে তা কে জানত।

তবু চমকেছিলাম, ভীষণভাবেই চমকে উঠেছিলাম হয়তো।

কাল রাতে যখন ট্রেন থেকে নেমেছিলাম তখন বাইরে শীত পড়ছিল ভীষণ। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসে বরফ ঝরছিল যেন। কোটের কলারটা তুলে দিয়েও কানটা ঢাকা যাচ্ছিল না। উদলা হাতজোড়া জমে আসতে চাইছিল শীতের প্রকোপে। স্টেশনে লোকজনের বিশেষ ভিড় ছিল না। মাঝে মাঝে দু-একজন চা-ভেন্ডারের চিৎকার ছাড়া সাড়াশব্দও তেমন ছিল না বললেই চলে। ব্যস্তভাবে হয়তো একটা কুলির জন্যই তাকাচ্ছিলাম এদিক-ওদিক; ঘন কুয়াশা ভেদ করে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক। পরনে একটা খাটো করে পরা লুঙ্গি। মাথা আর কান ঢেকে গায়ে একটা ময়লা চাদর জড়ানো। পায়ে একজোড়া মোটর টায়ারের স্যান্ডেল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সুটকেসটা হাতে আর হোল্ডারটা বগলে তুলে নিল ও। উহ্ কী ভীষণ কুয়াশা পড়েছে। আসুন সাহেব; দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন। আরো মাল আছে নাকি?

না, চল। লোকটার আগাগোড়া আর একপলক তাকিয়ে নিয়ে পিছুপিছু এগুতে লাগলাম ওর।

গেটের কাছাকাছি এসে লোকটা ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন সাহেব?

আপাতত ডাকবাংলায়। —এই শোনো, রিক্সা-টিক্সা পাওয়া যাবেতো এখন।

হ্যাঁ। আমার নিজেরই রেক্সা আছে। ও বলল। আর বলতে গিয়ে বারকয়েক কাশল ও।

মফস্বল শহর।

স্টেশনের সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে কিছুদূর গেলে বিজলিবাতির আর কোনো বন্দোবস্ত নেই। সামনে ছোট কেরোসিন বাতিটার ওপর নির্ভর করেই চলে রিক্সা। দোকানপাটগুলো খোলা থাকলে তবু কিছু আলো আসে রাস্তায়। কিন্তু এ পৌণে বারোটায় দোকানপাট বন্ধ করে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার মালিকরা। লোকজন কারো সাড়াশব্দ নেই। শুধু দু-একটা হ্যাংলা কুকুর মাঝে মাঝে চিৎকার করছে এখানে-ওখানে।

রাস্তাগুলো সব গর্তে ভরা। প্রতি গজ অন্তর একটা করে খাদ। এসব রাস্তায় রিক্সা চালাতে শুধু রিক্সাচালকেরই কষ্ট হয় না। আরোহীরও গা-হাত পা ব্যথা করে উঠে। বিরক্তি লাগে।

ইস্, রাস্তাগুলোর এই দুরবস্থা কেন? কেন যেন হঠাৎ বিড়বিড় করে উঠেছিলাম।

লোকটা একেবারে পেছনে তাকিয়ে নিয়ে বলল, বন্যায় সব ডুবে গিয়েছিল কিনা, তাই খাদ পড়ে গেছে।

তা—বন্যাতো কবে নেমে গেছে, এখন মেরামত করে নিলেই পারে।

কে করবে মেরামত—। হঠাৎ কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল লোকটা। রিক্সা থামিয়ে নিভে-যাওয়া বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে আবার চড়ল রিক্সায়।

ডাকবাংলোটা স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়।

পৌঁছতে মিনিট বিশেক সময় নিয়েছিল মাত্র।

লোকটা নিজহাতেই সুটকেস আর হোল্ডারটা তুলে রাখল বারান্দায়। তারপর বলল, আপনি দাঁড়ান! দারোয়ান বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ডেকে আনি।

শীতের রাতে একবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়লে সহজে উঠতে চায় না কেউ, তুলতে বেশ সময় নিয়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বোঝা যাচ্ছিল এমন আয়েশের ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয়েছে সে। তবু সে ভাবটা গোপন রেখে লম্বা একটা সালাম জানিয়ে মালপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে গেল দারোয়ান।

রিক্সাওয়ালাটা তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

কত দিতে হবে তোমায়? পকেট থেকে ব্যাগটা বের করে এগিয়ে যাই তার দিকে।

ও বলল, আপনার সাথে আর কী দরাদরি করব। আপনার যা খুশি তাই দিন।

সে কি হয়? কত রেট তা না জানালে আন্দাজে কী দেব আমি।

আপনার যা খুশি তাই দিন। আগের কথাটাই পুনরাবৃত্তি করল সে।

ব্যাগ থেকে একটা আধুলি বের করে হাতে তুলে দিলাম তার। এই নাও। হল তো?

জি হ্যাঁ। ঘাড় নেড়ে সায় দিল সে কথার। তারপর সালাম জানিয়ে গুটিগুটি পায়ে রিক্সাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল ধীরে।

অদূরে দাঁড়ানো দারোয়ানটা এতক্ষণ দেখছিল সব। ও চলে যেতে এগিয়ে এসে বলল, এ-বাবু। ইস্টেশনছে এঁহা চার আনা লেতা। আওর আপ একঠু আঠানি দে দিয়া উসকো। এ-হে বহুত জাস্তি দে দিয়া আপ। বহুত জাস্তি। চার-চার আনা পয়ছা। আপন মনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চারআনা পয়সার জন্য আপসোস করেছিল সে।

ওর কথায় কান না দিয়ে, যেখানে শোবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেখানে এসে ঢুকলাম। পথেই জংশনে খেয়ে এসেছিলাম। তাই রাতে আর খাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শোবার আগে আগামী দিনের করণীয় বিষয়গুলো ঠিক করে নিয়েছিলাম মনে মনে। ভোরে উঠেই হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা করে সরাসরি কাজগুলো সেরে নিতে হবে। এস. ডি. ও-র সাথে দেখা করতে হবে। সার্কেল অফিসারের সাথে আলোচনা করতে হবে টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে। তারপর দুপুরে টুনুর বাসায়।

দীর্ঘ আটবছর পর কাল হঠাৎ দেখতে পেয়ে হয়তো প্রথমে চিনতেই পারবে না টুনু। অবাক হয়ে মুখের পানে তাকিয়ে বলবে, কাকে চান? পরে চিনতে পেরে হয়তো আনন্দে

লাফিয়ে উঠে বলবে, উহ্‌ এতদিনে বুঝি টুনুর কথা মনে পড়ল তোমার। এই দীর্ঘ আটবছর পরে?

জীবনের মানচিত্রে আটটি বছর নেহায়েৎ কম নয়।

তবুও ভাবতে গেলে মনে হয় এই সেদিনের কথা।

কোলকাতায় একই পাড়াতে থাকতাম। পাশাপাশি বাসা।

টুনু তখন শাখাওয়াতে পড়ত ক্লাস সিক্সে কি সেভেনে।

আমি পড়তাম মিত্রয়। ওই একই ক্লাসে।

স্কুল ছুটির পর বিকেলে প্রায় ওদের বাসায় যেতাম।

ওরাও আসত মাঝে মাঝে।

আনাগোনা মিলমিশ আর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ছিল উভয় পরিবারের মধ্যে। আমাদের দুজনকে একসাথে দেখলেই বুড়ি দাদী ফোড়ন কাটত।

কিগো, কী হচ্ছে দুজনের মধ্যে। পিরীত টিরিত নয়তো। তাইলে বল। এখন থেকেই ওকালতি শুরু করে দিই।

তারপর ক্লাস এইটের বছর সে পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় উঠে গেল টুনুরা। আর তার মাস আটেক পরেই শোনা গেল ; একটা ননম্যাট্রিক ছেলের সাথে কোথায় পালিয়ে গেছে টুনু।

পালিয়ে গেছে—খবরটা প্রথমে মোটেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে অবশ্য বিশ্বাস না করে পারিনি।

এরপর মাঝখানে দুটি বছর।

দু-বছর পর হঠাৎ টুনুর সাথে দেখা ট্রেনে। দেশবিভাগের পর কোলকাতা থেকে ঢাকা আসবার পথে।

দেখা হতে মৃদু হাসল টুনু। বলল, কেমন আছ, ভালো তো?

ভালো। তুমি কেমন?

আমি বে-শ ভালো। ঠোঁট টিপে হেসেছিল টুনু। আরো অনেক কথার পর হাতে একটা ঠিকানা গুঁজে দিয়ে বলেছিল, মফস্বল শহরেই আছি। সময় পেলে একবার এসো। কেমন?

সময়ও হয়নি, আসতেও পারিনি কোনোদিন।

এবার হঠাৎ সরকারি কাজে এখানে আসতে হওয়ায় ; আসবার পথেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম টুনুর সাথে একবার দেখা করব।

কে জানে এ ক'বছরে কত পরিবর্তন এসেছে ওর দেহে-মনে চেহারায়।

পরদিন খুব ভোরে-ভোরেই বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা করলাম।

সরকারি কাজগুলো সেরে নিলাম একে-একে।

তারপর ঠিকানাটা পকেটে গুঁজে টুনুর খোঁজে।

সার্কেল অফিসের পিওনটাকে বলতে ও বলল, পাড়াটা আমি চিনি। চলুন না স্যার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কতদূর হবে পাড়াটা?

বেশি দূর নয় স্যার। আসুন না আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

বেশি দূর নয় বললেও বেশ দূরেই মনে হল। ঠিকানাটা মিলিয়ে বাসার সামনে পৌঁছে দিয়ে পিয়নটা চলে গেল। বলে গেল, এইতো এই বাসা স্যার। আমি এখন যাই তাহলে।

যাও। ওকে যেতে বলে সামনে এগিয়ে গেলাম।

বাঁশের ঘেরা দেওয়া মাঝারিগোছের একটা ঘর। ওপরে টিনের চালা। সামনে স্বল্প পরিসর। দু-তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মাটি নিয়ে খেলা করছে সেখানে। আমায় দেখে, মুখে আঙুল পুরে হা করে আমার দিকে তাকাল ওরা। বয়সে যে সবার চাইতে বড়, সে এগিয়ে এসে বলল, কাকে চাই? মুখের আদলটা তার টুনুকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বললাম, এটা কি তোমাদের বাসা খোকা?

হ্যাঁ!

তোমার মা বাসায় আছেন।

হ্যাঁ! আছেন। কেন কী চাই আপনার? অনেকটা মাতব্বরি চালেই জিজ্ঞেস করল ছেলেটা। মৃদু হেসে বললাম, দরকার আছে। তুমি যাওতো খোকা ভেতরে গিয়ে তোমার মাকে বল তোমার সালাম মামা এসেছে।

এ কথায় একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল ছেলেটা। তারপর বলল, আচ্ছা আপনি দাঁড়ান। আমি খবর দিচ্ছি মাকে। বলে ভেতরে চলে গেল সে।

একটু পরেই চট-ঝোলানো দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি মারল টুনুর মুখ।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

তারপর খলখলিয়ে উঠল টুনু। আরে সালাম তুমি, কী ভাগ্যি আমার! এসো এসো ভেতর এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন। ভেতরে এসো। অনেকটা হাত বাড়িয়ে ভেতরে এগিয়ে নিল টুনু। কইরে বিনু শুনছিস। মেয়েটা গেল কই?

মেয়ের কোনো সন্ধান না-পেয়ে নিজ হাতেই পাশের ঘর থেকে একটা মোড়া এনে আমায় বসতে দিল টুনু।

চোখ বুলিয়ে প্রথমে ঘরটাকেই দেখলাম। তারপর খুঁটে খুঁটে দেখলাম টুনুকে।

সত্যি, এ ক'বছরে অনেক বদলে গেছে টুনু। সেদিনের সেই তন্বী মেয়েটি আর নেই। ফরসা রঙটা তামাটে হয়ে গেছে। গোলগাল চেহারাটা গেছে ভেঙে।। কানের কাছে দু-একটা চুলে পাকও ধরেছে টুনুর।

তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ টুনু বলল, কী দেখছ অমন করে?

তোমায় দেখছি টুনু। পরক্ষণেই জবাব দিলাম, সত্যি তুমি অনেক বদলে গেছ।

তাই নাকি? টুনু মুখ টিপে হাসল। তা বদলাব না তো কি সারা জনম একরকম থাকব নাকি। বয়স হচ্ছে না? স্বল্পকাল থেমে আবার বলল, ভাগনে-ভাগনীও তোমার কম হয়নি। মোট চারজন।

কই ওরা কোথায়, ওদের কাউকে তো দেখছি না।

ওরা কি আর একমিনিটের জন্যে ঘরে থাকে। সারাটা দিন পঁইপঁই করে ঘুরে বেড়ায় পাড়ার বখাটে ছেলেগুলোর সাথে। বলে ছেলেমেয়েদের খোঁজেই হয়তো বাইরে বেরিয়ে গেল টুনু।

বসে বসে অতীতের কথাই ভাবছিলাম।

টুনু ফিরে এল একটু পরে। সাথে একটা সাত-আট বছরের ময়লা ফ্রক-পরা মেয়ে আর দুটো ছেলে। মেয়েটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে টুনু হেসে বলল, এই দেখো এটা হচ্ছে এক নম্বর। ডাক নাম বিনু। আসল নাম রেখেছি মনোয়ারা। আর এটা হচ্ছে মেজ ছেলে। এটা সেজ। বড়টা কোথায় গেছে। দাঁড়াও না আসুক ফিরে। পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আজ। বোঝা গেল টুনু রেগেছে। আগে রাগলে খুব সুন্দর দেখাতো ওকে। আজ কিন্তু তেমন কিছু মনে হল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করলাম, কর্তা কোথায়?

কর্তা? তার কথা আর বল কেন ভাই। লোকটার কি শান্তি আছে। এইতো সেই সকালে বেরিয়ে গেছে কাজে। পোস্টাফিসে পিয়নের কাজ। জানোত ও কাজে কত খাটুনি। দুপুরে একবার শুধু আসবে খেতে। তারপর খেয়েদেয়ে আবার বেরুবে। ফিরতে ফিরতে সেই রাত নিশুতি। টুনু থামল। কিছুক্ষণ বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল চুপচাপ। তারপর আবার বলল, কী ব্যাপার, তুমি এক কাপড়ে এসেছ নাকি? মালপত্র সাথে কিছু নেই?

এর উত্তর দিতে গিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে হল বই-কী। মাটিতে চোখ নামিয়ে সত্য কথাটাই শেষে বললাম।

আর তা শুনে বড় অবাক হল টুনু। সে কী! আমি থাকতে এখানে, তুমি উঠেছ ডাকবাংলোয়। সে কি?

লজ্জায় লাল হয়ে এলাম। কিছু বললাম না।

টুনুও যেন এ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে চাইল না। স্বল্পকাল নীরব থেকে-বলল, যে ক'দিন আছ, খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু এখানেই কোরো। কেমন? বলে উঠে দাঁড়াল টুনু। মোড়াটা নিয়ে পাকঘরে এসো, চুলোর উপর ভাত চড়িয়ে এসেছি। এসো, এখানে বসে গল্প করা যাবে তোমার সাথে।

পাকঘরে এসে রাজধানীর কথা জিজ্ঞেস করল টুনু। কে কোথায় আছে। কেমন আছে। এমনি আরও অনেক কথা।

তারপর পাড়ল নিজের কথা। শরীরটা দেখছ না কেমন দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে। রোগে ধরেছে আজ তিনবছর। এখানে ভালো ডাক্তার নেই। একবার ভাবছিলাম তোমার ওখানে গিয়ে চিকিৎসা করাব। কিন্তু, যাবার কি কোনো জো আছে। তিন-চারটে ছেলেমেয়ে ঘরে। ওদের কার কাছে রেখে যাই। ওর অবস্থাতো আরো খারাপ। লোকটা বোধ হয় বেশিদিন বাঁচবে না, সারাদিন যা খাটে, বেতন তো পায় মাত্র পঞ্চাশ টাকা। ওতে কিইবা

হয়। বলতে বলতে কেমন ম্লান হয়ে এল টুনুর মুখখানা। আর কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে। মেজ ছেলেটা কোত্থেকে ছুটে এসে বলল, মা। মেস থেকে ওরা লোক পাঠিয়েছে। বলছে আজ নাকি তরকারিতে তুমি বড্ড বেশি লবণ দিয়েছ। আর ওরা তোমায় রাখবে না।

ছেলের এ আকস্মিক কথায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল টুনু। চোখাচোখি হতে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ওর মুখখানা। মাটিতে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল। তোমার কাছে আর লুকিয়ে কী লাভ বল। বোঝ তো, একমাত্র ওর আয়ে কিইবা হয়। পাশে পি. ডাব্লিউ. ডি-র মেস আছে। সকালে বিকেলে ওদের ভাতটা পাক করে দিই। বলতে গিয়ে লজ্জায় মুখখানা আরো নুয়ে এল টুনুর। আরো বেশি অপ্রস্তুত হল সে। আর সে ভাবটা কাটিয়ে উঠবার জন্যই হয়তো বলল, রান্নাবান্নাই তো আমাদের কাজ। ঘরে যেমন রাঁধি। তেমনি ওদেরও রেঁধে দি। মাস মাস কুড়িটা টাকা। কমতো নয়। চুলোর উপর থেকে ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল টুনু। কাপড়ের আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, উনি বোধ হয় এলেন। দেখি, বলে পাকঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উনি এসেছেন সালাম। এসো, দেখা করে যাও।

টুনুর স্বামীকে দেখে এমনভাবে চমকাতে হবে তা কে জানত।

তবু চমকালাম, ভীষণভাবেই চমকে উঠলাম হয়তো। পরনে একটা খাটো করে পরা লুঙ্গি, গায়ে একটা ময়লা চাদর জড়ানো। পায়ে একজোড়া মোটর-টায়ারের স্যান্ডেল। লোকটাকে চিনতে এতটুকুও ভুল হল না।

সেও চিনল আমায়। আর, চিনল বলেই তো মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। হাতমুখ ধুবার অছিলায় ছুটে কলতলায় চলে গেল সে।

ও চলে গেলে কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় টুনু বলল, পিয়নের কাজ করলে কী হবে। লোকটার প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে। খবরদার। আমি যে মেসের ভাত পাক করে দিই, ঘুণাক্ষরেও এ কথাটা বলো না ওকে। তাহলে রেগে আগুন হয়ে যাবে। টুনুর কণ্ঠে অনুরোধের সুর। তুমি বসো। উনি হাতমুখ ধুয়ে আসুন। তারপর গল্প করবে। চুলোটা খালি যাচ্ছে। আমি তরকারিটা তুলে দিয়ে আসি।

হাতমুখ ধুয়ে টুনুর স্বামীও ততক্ষণে ফিরে এসেছে আবার। লজ্জা আর সঙ্কোচের ভাবটা তখনো কাটেনি। একখানা ছেঁড়া গামছায় হাত মুছতে মুছতে কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ সে বলল, মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংসার চলে না। তাতো বোঝেনই। অফিস ছুটির পর অগত্যা তাই রাতে রিক্সা চালাই। বলতে বলতে হঠাৎ আমার হাতজোড়া আপন মুঠোর মধ্যে তুলে নিল ও, তারপর চারদিকে সতর্কভাবে তাকিয়ে নিয়ে ধরা-গলায় বলল, দোহাই আপনার সালাম সাহেব। ও কথাটা বলবেন না টুনুকে। প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে ওর! জানতে পারলে কেলেঙ্কারি কিছু-একটা ঘটিয়ে বসবে। দোহাই আপনার—।

অপরাধ

না আর সইতে পারে না সালেহা। জীবনটা একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তার কাছে। বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর। চারটে বছর মানুষের জীবনে নেহায়েৎ কম নয়। এ চারটে বছর কেমন করে তাকে কাটাতে হয়েছে তা সেই একমাত্র জানে। দু-বেলা চারটে ভাত খেতে পারলেই যদি মানুষ সুখী হত, তাহলে সালেহার অসুখী হবার কোনো কারণই ছিল না। মানুষের জীবনে অনেক আমোদ-আহ্লাদ থাকে, কিন্তু তার কোনোটাই ভোগ করতে পারেনি সালেহা। কারাগার। এ চারটে বছর ঠিক যেন কারাগারের ভিতরই দিন কাটিয়েছে সে। এতটুকু স্বাধীনতা নেই, নেই নিজের ইচ্ছামতো চলাফেরা করার এতটুকু অধিকার।

পীর সাহেবের বাড়ির কঠোর শাসন। ঘরের ঝি-বৌদের বাইরের লোক যাতে দেখতে না পায়, তার জন্যে জানালায় মোটা পর্দা টাঙানো। তা একটু ফাঁক করে বাইরে একপলক তাকাতে যাবে তাও স্বামীর নিষেধ।

শোবার ঘরের ছোট্ট কামরাটা আর রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ভরা পরিসরটার ভেতর তার গতিবিধি সীমাবদ্ধ। বাইরের মুক্ত আলো-বাতাসে প্রাণজুড়ানো ছোঁয়া সে আজ চারটে বছর ধরে পায়নি। অসহ্য! একেবারে অসহ্য বোধ হচ্ছে সালেহার। এ চারটে বছর একটু প্রাণ খুলে শ্বাসও নিতে পারেনি সে। গলা ছেড়ে একটা কথা বলতে কিংবা হাসতেও সাহস পায়নি। পীর সাহেবের কঠোর আপত্তি এতে। মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই। শব্দ করে হাসতে নেই। পদে পদে বাধা। পেট ভরে চারটে ভাত খাবে তারও জো নেই। মেপে মেপে ভাত ওঠে সবার পাতে। পীর সাহেব বলেন, অতিরিক্ত খেলে কেয়ামতের দিন তার হিসাব দিতে হবে।

অনেক সয়েছে সালেহা! অনেক! কিন্তু তার প্রতিদানে কী পেয়েছে সে? দুটি চোখ পানিতে ভিজে ওঠে সালেহার। ভালো করেই সে জানে, যা সে চায় তা তার আশি বছরের স্বামীর কাছ থেকে কোনোদিনও পেতে পারে না। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে অশান্ত বুকটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে।

আঠার বছরের তরুণী সে। বিয়ে হয়েছিল চৌদ্দ বছর বয়সে। বাবার এ কীর্তির কথা মনে পড়তে আরো জোরো কান্না আসে—বাবা! তার বাবা কী করে এ দোজখখানায় তাকে ছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে?

সমস্ত কাহিনীটা ভাবতেও তার আজ মন কেমন করে। ঝিমঝিম করে মাথার ভেতরটা। মনে হয় দুঃস্বপ্ন দেখে উঠল এইমাত্র। কিন্তু দুঃস্বপ্ন কি মানুষের জাগরণে এমনি বারবার করে ফিরে আসে? হয়তো আসে, নইলে বিগত এই ক'টি বছরের ভেতর কেন সে ভুলতে পারল না সেই বছরটিকে—

সে বছর বর্ষা এসেছিল বড় অসময়ে। ভীষণভাবে। পথঘাট ডুবে গিয়েছিল সব। দিগন্ত ছোঁয়া অথৈ পানিতে টলমল করছিল চারদিক।

শোনা গেল পলাশপুরের পীর সাহেব এ পথে আসবেন। জাঁদরেল পীর। পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান পুরুষের নাম পর্যন্ত নানাবিধ অলৌকিক কীর্তিতে জড়ানো। দাদা আর বাবা এর ভয়ানক ভক্তশিষ্য। খবরটা এ তল্লাটে শোনা যেতেই বাবা সাদর আহ্বান জানালেন, গোলামি-ঘরে হুজুরকে মেহেরবানি করতে। হুজুর মেহেরবানি করলেন। একা নয়। একপাল সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে করে।

বৈঠকখানায় ধবধবে বিছানা পেতে তাদের থাকবার আস্তানা করা হল। বারবাড়ির প্রাঙ্গণে খোঁড়া হল ইয়া বড় বড় দুটি চারমুখো উনুন।

পীর সাহেবের লম্বা দাড়ি আর নুরানি চেহারার সুখ্যাতি শুনে পাড়ার কৌতূহলী মেয়েদের জোড়া-জোড়া চোখের মেলা বসেছিল ওদের বাংলাঘরের বেড়া ঘিরে। সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সালেহাও একবার চুপি দিয়েছিল। কিন্তু লম্বা দাঁড়ি বা নুরানি চেহারার বিশেষত্ব বুঝতে না-পেরে বিরক্ত হয়েই সরে এসেছিল মিনিট-দুই পরে।

রাত্রে দাদা তাকে ডেকে বললেন, যা নাতনী ভালো দেইখ্যা একখানা শাড়ি পইরা আয়।

অবাক হয়ে সালেহা দাদার মুখের দিকে হা করে তাকিয়েছিল, শাড়ি ক্যান পরমু দাদা?

হুজুরের হাত-পাওগুলান একটু টাইনা-টুইনা দিয়া আয় সালু, বহুত দোয়া করবো।

চৌদ্দ বছর বয়স তখন সালেহার। ছোট একটা ঘোমটা দিয়ে বাবার সাথে, পীর সাহেবের পাশে এসে দাঁড়াল সে।

বাবা বললেন, আমার লেড়কি, হুজুর।

হাত বাড়িয়ে পীর সাহেবকে ছালাম করল সালেহা। হাত তুলে দোয়া করলেন পীর সাহেব। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার লেড়কি নাকি? বহুত আচ্ছা লেড়কি আছে।

হুজুরের হাত-পাগুলো টিইপা দেওতো মা—বাবা ইশারা করলেন সালেহাকে।

ভীষণ লজ্জা করছিল সালেহার।

তোমহার নাম কী আছে? পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন। কেমন মিষ্টিই না লেগেছিল কথা ক'টি সেদিন।

কিন্তু সালেহা কি তখন জানত যে সে, বুড়োটা একটা পুরোপুরি জন্তু, পাক্কা একটা খুনী?

চারটে বছর! চারটে বছর নয়তো ঠিক চারটে যুগ। সালেহাই জানে এ ক'টা বছর কেমন করে সে জ্বলেপুড়ে মরছে। প্রথম থেকেই জানত সে, এ বুড়োর সাথে বিয়ে তার মৃত্যুরই সামিল। কিন্তু, জেনেও কি সে প্রতিবাদ করতে পেরেছিল? সে কি মুখ ফুটে বলতে পেরেছিল তোমরা কেন এ বুড়োর সাথে বিয়ে দিচ্ছ আমায়? আমার দেহমনের স্বাভাবিক স্বপ্ন কি পূরণ করতে পারবে এ বুড়ো? কিন্তু কিছুই বলতে পারেনি সালেহা। বলবার সাহসের অভাব ছিল তার ভেতরে। বললেও হয়তো কেউ আমল দিত না।

পাশের বাড়ির মেয়েদের কাছেই প্রথমে সে কথাটা শুনেছিল। কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। আশি বছরের এক বুড়োর সাথে তার বিয়ে এ-ও কি সম্ভব? কিন্তু দিন-দুয়েকের ভেতর সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। দাদা মাকে ডেকে বললেন, আমাগো সালেহারে পীর সাহেবের ভা-রি পছন্দ অইছে।

মা কোনো উত্তর দেয়নি। সালেহা ভালো করেই জানে এ বিয়েতে মায়ের মত ছিল না। প্রতিবাদও তিনি করেছিলেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি। বাবা বলেছিল মাইয়ালোকে ভালো মন্দের কী বোঝে? তাদের জিজ্ঞাইবার বা কোন্ দরকারডা। আরে পীর জামাই কি সক্কল মাইয়ার ভাইগ্যে জোটে? মাইয়ার কপাল ভালা কইতে অইবো।

কপাল! এ ক'বছর হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সালেহা তার কপালকে। পাঁচ সতীনের ঘর। পাঁচ সতীন নয়তো ঠিক পাঁচ-পাঁচটা দজ্জাল বাঘ যেন। ওরা সালেহার আগে এসেছে, তাই ওদের দাবিও তার আগে। উঠতে-বসতে তাদের তীব্র কটাক্ষ সালেহার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া বুঝি আরম্ভ হয়ে গেছে তার ভেতর। আর বাঁচবে না সালেহা ; আর কিছুদিন এখানে থাকলে সে নিশ্চয়ই মরে যাবে।

বাইরের ঘরে কত লোক আসে, তাদের চোখে না দেখলেও গলার স্বরে আন্দাজ করতে পারে সে। এক-এক সময় মনে হয় ছুটে গিয়ে তাদের কাছে দাঁড়ায় সালেহা। সবকিছু জানিয়ে দেয় ওদের। সবার সামনে দাঁড়িয়ে বুড়োর ছদ্ম-মুখোশ খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে এখানে কেন ওরা আসে? কেন ওরা একটা খুনীর পায়ে এত শ্রদ্ধা নিবেদন করে? খুনী! খুনী! বুড়োটা একটা খুনী ছাড়া আর কিছু নয়। সালেহাকে সে খুন করেছে।

একটা পূর্ণযৌবনা তরুণীর আশা-আকাঙ্ক্ষায়-ভরা কোমল হৃদয়কে ছুরি দিয়ে কুচিকুচি করে কেটে ফেলছে। ওই বুড়োটা সে। সব বলে দেবে। সবকিছু। কিন্তু বড় দুর্বল সে, তাই কিছু বলা হয় না।

সালেহা বুঝতে পারে, এ দুর্বলতাই এতদূর নিয়ে এসেছে তাকে। নইলে প্রথমেই সে প্রতিবাদ করতে পারত। স্পষ্ট মনে আছে—তাদের গ্রামের চৌধুরীবাড়ির মেয়ে হাসিনার কথা, বাবার পছন্দ-করা জায়গায় বিয়ে করতে স্পষ্ট আপত্তি জানিয়েছিল সে।

শেষে একগুঁয়ে মেয়েটি বাবার মুখে ছাই দিয়ে একরাতে পালিয়ে গেল, কলেজ-পাশ-করা এক ছেলের সাথে। সালেহার স্পষ্ট মনে আছে, গ্রামের ছেলেবুড়োরা কেমন ছি ছি করছিল। পুকুর ঘাটে, ঘরের দাওয়ায়, ঢেঁকির চারপাশে জটলা পাকিয়ে গ্রামের মেয়েরা কেমন হাসাহাসি করত, চৌধুরীবাড়ির কলঙ্কের বিষয় আলোচনা করে। সালেহাও যোগ দিত তাদের সাথে।

কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছে। হাসিনা ঠিকই করেছিল। হাসিনার মতো সালেহাও যদি পালিয়ে যেতে পারত তাহলে জীবনটা এত দুঃখের হত না।

বিয়ের রাতে পাড়াপড়শিরা যখন মুখের কোণে হাসি টেনে সালেহাকে সাজাতে এল, মা তখন বারবার আঁচলে চোখ মুছছিল। আজও সে-সব কথা সালেহা ভুলে যায়নি। মামারা অনেক সান্ত্বনা দিচ্ছিল। তুই কান্দছ ক্যান সালুর মা। মাইয়ার তর বরাত ভালো, বেহেস্তের হুর অইয়া থাকবো।

পরাণ দিয়া পীর সাহেবের খদমত করিছ সালু, আখেরাতে বেহেস্ত পাইবি। পাল্কিতে চড়িয়ে দিয়ে নানা-নানী তার কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলে দিয়েছিল বিদায় দেবার সময়।

হ্যাঁ এ ক'বছরে বেহেস্তের আস্বাদ ভালো করেই পেয়েছে সালেহা। বেহেস্তের অমরযৌবনা হুরত্ব লাভের আশায় আজ তার বয়সের বসন্তসম্ভারে অসময়ে উল্টো হাওয়া বইছে। অকাল-বার্ধক্য আজ ইশারা দিয়ে যেন তাকে ডাকছে। অসহায় আর্তনাদে পাশবালিশটাকে বুকে চেপে ধরে সালেহা! কিন্তু প্রাণহীন এ তাকিয়াটাকে বুকে জড়িয়ে আর কতদিন সে একটা মানবশিশুর উপস্থিতিকে ভুলে থাকবে? কতদিন রিক্ত বুকের হাহাকার নিয়ে লোক-সমাজে অভিনয় করবে সব পাওয়ার পরিতৃপ্তির? বারকয়েক এপাশ-ওপাশ করে অসহ্য উত্তেজনায় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সালেহা। আজ মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার পালা তার। জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় সালেহা। আর কাউকে ভয় করবার প্রয়োজন নেই। হাত বাড়িয়ে পর্দাটা ফাঁক করে সে। ফিনফিনে বাতাসের সাথে একঝলক চাঁদের আলো এসে পড়ে ওর মুখের উপর। পূর্ণিমার ভরা চাঁদ। সেদিকে একবার মুখ তুলে চেয়ে কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে সে। ওহ্ খোদা, প্রকৃতির কত মুক্ত সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত সে!

রাত্রি বেড়ে চলে। জানালার পাশে দোলানো চাঁদটা একটু এগিয়ে গেছে পশ্চিমে। আর তার তেরছা আলোয় দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ একটি তরুণী-ছায়া জানালার পাশ থেকে দরজার দিকে এগোচ্ছে। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে কম্পিত পা দুখানা—

পাশের কামরা থেকে বড় বিবির নাক ডাকার শব্দ আসছে। কোণের ঘরের জানালার ফাঁক গলিয়ে মিট্‌মিটে আলো আসছে বাইরের দিকে, পীর সাহেব আজ ঝি-বৌ-এর কাছে আছে।

সেদিকে একবার ফিরে ছায়া আবার সরতে শুরু করে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে। পূর্ব-পুরুষদের কবরখানার কাছে এসে আর-একবার সে থমকে দাঁড়ায়। সম্মুখে উন্মুক্ত আকাশের নিচে পায়ে চলা অপরিসর গ্রাম্য পথ। খানিক বাদে পদধ্বনি বেজে ওঠে সে পথের ধূলিকায়। তারপর—

সালেহার হুঁশ নাই। হুঁশ হল চুলের মুঠিতে টান পেয়ে। এ্যাঁ সে পালিয়েছে। স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি। এই দীর্ঘ ক'ক্রোশ পথ সে হেঁটে এসেছে একাকী। একে কি পালানো বলে? এই কি পালানোর সংজ্ঞা? তা না হলে চুলের মুঠি-ধরা রুদ্রমূর্তি বাবার গলায় ও আওয়াজ কিসের—হারামজাদী আমার মুখে চুনকালি লাগাইলি তুই? মানসম্মান ভেত্তে দিলি আমার। আত্মসম্মানী জ্ঞানী সমাজী জীব বাবা। কলঙ্কিনী মেয়েকে মারবার অধিকার তার আছে। তাই খোদাই দান হাত-পা দুটো সমানভাবে মেয়ের উপর চালাতে থাকে।

নাহ্ এবারে সে প্রতিবাদ করবে। নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু ভাষা কোথায়? এ কী! সে কাঁপছে? বাবার পা দু-খানি জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলছে—আর মাইরো না বাবজান, তোমার পায়ে পড়ি আর মাইরো না. . .। ক্লান্ত পিতা ক্ষান্ত হয় এবারে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাদী কাঁদছিলেন। মেয়েটাকে ছুড়ে ফেলে দিতেই তিনি ধরে ফেললেন। দাদীকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে সালেহা। বুকটা জ্বলছে না ব্যথা করছে ঠিক বুঝতে পারে না সে। শুধু মনে হচ্ছে হাঁটুর উপর ওঠা কাপড়টাকে নামিয়ে নেবার ক্ষমতা বুঝি তার লোপ পেয়েছে।

আজ মা বেঁচে নেই! বেঁচে থাকলে বাবা তাকে এরকমভাবে মারতে পারতেন না। তার বিয়ের পরেই মারা গেছে। মায়ের কথা মনে পড়তে দ্বিগুণ হয়ে এল কান্নার বেগ। পাষাণ বাবা। মাকেও এরকমভাবে মারত। মার খেয়ে মায়ের হাড়গুলো সব জখম হয়ে গিয়েছিল। মা কাঁদত না, কোঁকাত। আর সুদূর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাবত।

উহ্! হাতদুটো আর পিঠটা কীরকম ফুলে যাচ্ছে সালেহার! মায়েরও মাঝে মাঝে এরকম হত। কেরোসিন তেল গরম করে মা মালিশ লাগাত। বাবা না জানলেও সে জানে বাবার মার খেয়েই মা মারা গেছে। ডাকু! ডাকু, এরা সবাই ডাকু! খুনী! উহ্ আর কিছু ভাবতে পারছে না সালেহা। অসাড় হয়ে আসছে তার সমস্ত শরীর।

বিকেলে লোক এল পীর সাহেবের বাসা থেকে। দাদা হাতজোড় করে বললেন—অবুঝ মাইয়া একটা খারাপ কাম কইরা ফেলছে, পীর সাইবেরে কইলা দিয়েন মাফ কইরা দিতে।

মাফ! মাফ করবেন পীর সাহেব একজন দুশ্চরিত্রা মেয়েকে?

খবর শুনে সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে পীর সাহেবের। বারান্দায় কতক্ষণ দ্রুত পদচারণ করলেন তিনি, পীর বংশের কলঙ্ক! এ কলঙ্ক তিনি সইবেন কী করে?

দুশ্চরিত্র মেয়ের শাস্তি—এক শ—এক—কোড়া এক—শ—এক। গর্জে উঠলেন পীর সাহেব, চমকে উঠে বাবা। সকালে রাগের উপর মা-মরা মেয়েকে তিনি যথেষ্ট মার মেরেছেন। তার ওপর এক শ-এক কোড়া এক—শ—এক বেত্রাঘাত! সে কি সালেহার কোমল দেহে সইবে? অথচ পীর সাহেবের আদেশ।

আমার পিঠের উপর এক শ এক কোড়া মারেন হুজুর! ওই মাইয়াটারে মাফ কইরা দেন! বাবা পীর সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে।

পীর সাহেবকে কোনো উত্তর দিতে হল না এর। উত্তর নিয়ে এল সামছুল। সালেহার ছোট ভাই।

কাল থেকে রক্তবমি করতে করতে ঘন্টাখানেক হয় সালেহা মারা গেছে।

সপাং করে কে যেন একটা চাবুকের ঘা মারল উপস্থিত জনতার পিঠের উপর। অস্পষ্ট গুঞ্জরণ শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে—মাগীটা মরবে না? পীর সাইবের মুখে ছাই মারি যাবে কোথায়? পীর সাইবের বদ্‌দোয়া লেগেছে।

সায় দিয়ে পীর সাহেবও মাথা নাড়লেন—গুনাহগারকো, আল্লাহ তায়ালানে কভি মাফি নাহি করতা হ্যায়।

স্বীকৃতি

জীবনকে অস্বীকার করিস না মনো! অস্বীকার করিসনে তোর আপন সত্তাকে, অনেক কিছু তোর করবার আছে এ জীবনে।

অনেক চেষ্টা করেছে মনোয়ারা, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারেনি জামানের এ কথা কয়টি। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে, বারবার মনে পড়ে যায়। আর ক্ষণেকের জন্য আনমনা হয়ে পড়ে সে।

সেদিনের সেই ফ্রক-পরা ছোট মেয়েটি শাড়ির পোঁচ লাগতে-না-লাগতেই যে কখন যৌবনের রোজনামচায় নাম লিখিয়ে ফেলল তা নিজেও ভাবতে পারে না মনোয়ারা। বুড়ি দাদীর চোখেই প্রথম ধরা পড়ছিল সে। পান-খাওয়া লাল দাঁতগুলোকে ফাঁক করে ভর্ৎসনার সুরে ছেলেকে বলেছিলেন তিনি, আমি মরে গেলে তোদের যে কী হবে তাই ভাবছি।

সদ্য অফিস-ফেরত ছেলে অবাক হয়েছিল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে—কেন কী হয়েছে মা?

মেয়েটার যে বিয়ে দিবার বয়স হয়ে গেছে আর কি কোনো খোঁজ রেখেছিস? রাখবিই বা কেন, তুই কি কোনোদিন সংসারের কথা ভেবেছিস, না ভাবিস? যাই বল বাবা, মেয়ের জন্য এবার একটা ভালো দেখে জামাই দেখ।

জামান তো ওকে প্রথমে দেখে চিনতেই পারল না, চিনবেই বা কী করে? চার বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে ; এ চার বছরের ভেতর অনেক পরিবর্তন এসে গেছে মনোয়ারার শরীরে, চেহারায়।

অবাক হচ্ছ যে, চিনতে পারছ না? আমাদের মনো, মনোয়ারা গো। মা ওর সংশয় দূর করলেন।

ও! ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে, নিজ অজ্ঞতাকে ঢাকতে চাইল জামান।

ক্লাশ সেভেনে পড়ে। গতবছর বৃত্তি পেয়েছিল। মায়ের কথায় আবার মুখ তুলে মনোয়ারার দিকে তাকাল জামান। সে ততক্ষণে সরে গেছে, পর্দার আড়ালে। তার এই আড়ালের ঘটনাকে আর একদিন জামান বলেছিল, পর্দাই তোমাদের পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে মনো। এ রহস্যঘেরা পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ থেকে তোমাদের বঞ্চিত করেছে।

জামানের কথায়, অবাক হয়েছিল মনোয়ারা, কিন্তু কোনো উত্তর দেয়নি। শুধু চেয়ে ছিল ওর দিকে, কাজল-কালো চোখ দুটো মেলে। জানো, ও খুব ভালো রান্না করতে জানে। মা বললেন।

হু। মৃদু হাসল জামান।

ওই যে টেবিলক্লথটা দেখছ না। ওটা মনোয়ারা সেলাই করেছে। বেশ সুন্দর হাতের কাজও জানে ও।

মায়ের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হতে পারে না মনোয়ারা। বরং পর্দার এপাশ থেকে রেগেছে মনে মনে—মা যেন কেমন! মনোয়ারা জানে, জামানের কাছে এ-সবের কোনো মূল্য নেই। মনোয়ারার আন্দাজ অহেতুক নয়। কেননা, একটু পরে চায়ের পেয়ালাটা যখন সে জামানের দিকে এগিয়ে দিল তখন চায়ে একটা চুমুক দিয়েই জামান হেসে উঠল—চাতো তৈরি করেছিস খাসা করে। লেখাপড়ায়ও নাকি বৃত্তি পেয়েছিস। হাতের কাজেও বেশ ভালো। কোনো পলিটিক্যাল ফাংশনে টাংশনে যাস?

ফিক করে হেসে উঠে একটু দূরে সরে দাঁড়াল মনোয়ারা।

পটেন কাল ফা-সা-নটা কি বাবা, তাতো বুঝলাম না। মায়ের অজ্ঞতা পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল মনোয়ারার কাছে। তাই সে সরে যেতে চেয়েছিল।

যাচ্ছিস কোথা? বস, তোর সাথে কথা আছে। আদেশের সুরে বলল জামান।

আঁচলটাকে গুটিয়ে নিয়ে মনোয়ারা বসল। সামনের একখানা চেয়ারের ওপর।

পলিটিক্যাল ফাংশনটা বুঝলে না মামী, ওটা হচ্ছে রাজনীতি করা। মানে সভাসমিতি করা, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া—।

অ—বক্তৃতা দেওয়া? ওতো ব্যাটা ছেলেরা করে। মা অবাক হন।

না, মেয়েরাও করে। মায়ের অজ্ঞতা দূর করতে চেষ্টা করে জামান।

এতক্ষণ চুপটি করে মনোয়ারা চেয়েছিল জামানের মুখে দিকে। এবার দৃষ্টি বিনিময় হল ওদের জামান আর মনোয়ারার। মনোয়ারা চোখ সরিয়ে নিল কিন্তু জামান পারল না, চোখদুটো ওর মুখের উপর রেখেই বলল—বেশ সুন্দর হয়েছিস তো দেখতে। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল মনোয়ারার মুখখানা।

অথচ এই সেদিনের কথা। যখন ওরা ছোট ছিল ; একসাথে হুড়োহুড়ি আর খেলাধুলা করত, ওরা ঘর বাঁধত, বরবধূ সাজত। কই সেদিন তো মনোয়ারা রাঙা হয়ে উঠেনি। অদ্ভুত মানুষের জীবন।

হ্যাঁ, অদ্ভুতই তো! নইলে ভাবতেও তো পারছে না মনোয়ারা, কেমন করে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল? কেমন করে যে কৈশোর আর যৌবন ছাড়িয়ে প্রবেশ করল প্রৌঢ়ত্বের কোঠায়।

বিছানার চাদরটা গুটিয়ে ফেলল। ময়লা হয়ে গেছে ভীষণ। না কাচলে আর নয়। আবুলকে পাঠিয়ে দোকান থেকে সাবান আনিয়ে নিতে হবে একটা। কিন্তু—কী যেন ভাবছিল সে একটু আগে।

ও—হ্যাঁ তার ছোটবেলাকার কথা, আর জামানের কথা। এরপর আরও দু-একটা দিন গেছে অসহ পরিবেশের ভেতর দিয়ে। তারপর তৃতীয় দিনে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে দুজনাই।

চল্ সিনেমায় যাব। জামান বলল, সাথে কিন্তু আর কাউকে নিতে পারবি না, শুধু তুই একা।

মা যেতে দিলে তো।

কেন যেতে দেবে না? মাকে শুনিয়ে শুনিয়েই জোরগলায় বলল জামান, চোরের সাথে যাচ্ছিস তো না, আমার সাথে যাচ্ছিস, নে—কাপড় পরে নে, সময় হয়ে এল।

বাধা দেবার কোনো পথ রাখেনি জামান, মা এসে শুধু বোরখাটা এগিয়ে দিলেন—নে, সময় হয়ে এল।

রিক্সা আনতে গিয়েছিল জামান, ফিরে এসে মনোয়ারার হাতে বোরখা দেখে অবাক হল—ওটা আবার কেন?

মা বলেছেন। মুখ নিচু করে উত্তর দিল মনোয়ারা।

ওর হাত থেকে বোরখাটা টেনে নিয়ে বারান্দায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে, একহাতে ওর একখানা হাত ধরে, হেঁচকা টান দিল জামান।

চল্—

রিক্সায় চড়তে এসে অবাক হল মনোয়ারা—রিক্সায় পর্দা লাগানো হয়নি যে?

প্রয়োজন নেই বলে। নিস্পৃহের মতো উত্তর দিল জামান।

বাবা আর চাচা জানতে পারলে কিন্তু ভীষণ গাল দেবেন। মনোয়ারার কণ্ঠে ভয়ের আভাস।

বিরক্তি বোধ করে জামান। নে নে উঠবি তো ওঠ। বাবা বকবে, চাচা বকবে, কিন্তু কেন বকবে বল্তো? তোদের কি বাইরে বেরুতে নেই নাকি?

আর কথা কাটাকাটি করেনি মনোয়ারা। আসলে কোনো কথাই যেন সে অবিশ্বাস করতে পারেনি যুক্তিহীন বলে। চুপটি করে রিক্সায় বসেছে, রিক্সা ছেড়ে দিয়েছে।

জামান নামল প্রথমে—নেমে আয়! দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে মনোয়ারাকে ইশারা করল জামান।

ভীষণ ভয় পেয়েছিল মনোয়ারা। অজানা অচেনা এ কোন্ জায়গায় জামান তাকে নিয়ে এল? পরক্ষণে যার সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হল, তাকে দেখে আরো ঘাবড়ে গেল সে। আধপাকা চুল, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, তীক্ষ্ণ চোখ, উন্নত নাসিকা, গৌরবর্ণ দেহ—এক বলিষ্ঠ পুরুষ।

এর কথাই কি তুমি বলেছিলে জামান? উহ্ কী কর্কশ গলা! মনোয়ারা আর একবার ফিরে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে।

হ্যাঁ এর কথাই বলেছিলাম।

নাম কী তোমার! আবার সে কর্কশ গলার প্রশ্ন। নামটা বলবার সঙ্কোচও কাটিয়ে উঠতে পারছিল না মনোয়ারা, জামানই ওর হয়ে বললে—নাম মনোয়ারা।

কিন্তু ও এত লজ্জা করছে কেন? ওকে বুঝিয়ে দাও, যে পথে এসেছে, সে পথে লজ্জা-সঙ্কোচ সবকিছু ছেড়ে ফেলে মাথা উঁচিয়ে চলতে হবে ওকে।

যে পথে এসেছে? কোন্ পথে? রীতিমতো ঘেমে উঠল মনোয়ারা। লোকটা কী হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর বুকের দিকে। না—না ঠিক বুকের দিকে নয়, গলার সাথে ঝুলানো নেকলেসটার দিকে। অলঙ্কার পরাটাকে তুমি খুব পছন্দ করো বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ এ প্রশ্নের হেতু? মাথাটা যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে মনোয়ারার। কিন্তু ও অলঙ্কারের ইতিহাসটা যদি তুমি জানতে, তাহলে নিশ্চয়ই ওগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিতে। না, ইতিহাস জানবার কোনো দরকার নেই ওর। জামানের প্রতি ভীষণ রাগ হয় মনোয়ারার। ভদ্রলোক আবার ততক্ষণে বলে চলেছেন—প্রাচীনকালে, প্রাচীনকালে কেন? মধ্যযুগেও পুরুষেরা নারীর উপর অমানুষিক উৎপীড়ন চালাত। যখন-তখন যথেচ্ছভাবে তাদের মারপিট করত শুধু তাই নয়। কোমরে, গলায়, হাতে, পায়ে শিকল বেঁধে ঘরের ভেতর ফেলে রাখত ওদের। পাছে ওরা পালিয়ে যায়। নারী সে ট্র্যাডিশন ক্ষুণ্ণ করল না। আজও তাই তারা হাতে, পায়ে, গলায় শেকল—অবশ্য আগে লোহার ছিল, এখন সোনার পরে গর্ব অনুভব করে।

সে দিনই ঘরে ফিরে মনোয়ারা তার সমস্ত অলঙ্কার আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছে। আর পরেনি।

মা আর দাদী অবাক হলেন।

কিরে? এত কান্নাকাটি করে বাপের কাছ থেকে ওগুলো আদায় করে নিলি কি আলমারিতে তুলে রাখার জন্যে?

সেদিন কোনো উত্তর দেয়নি মনোয়ারা। উত্তর আর কবে, কখন, কোন্ কথারই বা দিয়েছে সে? অফিস থেকে ফেরার পর স্বামী যখন আবোলতাবোল আরম্ভ করে, তখন কি মনোয়ারা ইচ্ছা করলে আর উত্তর দিতে পারে না? কিন্তু কৈ দেয়নি তো কোনোদিন। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছু বলতে পারে না। লোকটা কেমন ভেঙে পড়ছে দিন দিন। সারাদিন হিসাবের খাতায় সারি সারি অঙ্ক কষলে কারই বা মেজাজ ঠিক থাকে?

ওই যা, চাদরটা এবার কী করে কাচবে মনোয়ারা? পানিটা যে চলে গেল, তিনটার আগে কি আর আসবে?

আকাশে তখন বিবর্ণ মেঘের ছুটোছুটি। এলোমেলো হাওয়ায় চুলের গোছা বারবার কপালে লেপ্টে আসছে সাবানের পানিতে। আবার আনমনা হয়ে পড়ে মনোয়ারা।

মাঝে কিছুদিনের জন্য জামান কোথায় চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে মনোয়ারাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব বুঝিয়ে দিল। তাকে কী করতে হবে। মাথা নাড়ল মনোয়ারা, না সে পারবে না। রাগে ফেটে পড়ল জামান—এটা পারবিনে ওটা পারবিনে, পারবি কি বল্ তো?

রান্না করতে। আঁচলের আড়ালে মুখ টিপে হাসছিল মনোয়ারা।

হ্যাঁ ওটা ছাড়া আর পারবিই বা কি? কিন্তু এমন একদিন আসবে সেদিন আমাদের বলার আগেই নারী এগিয়ে আসবে পাশে। রাগের মাত্রা বাড়ল বই কমল না জামানের, পাকঘরের ভেতরেই তো তোরা তোদের বন্দি করে রেখেছিস। আচ্ছা বল্তো মনো, এই সারাটা দিন পাকঘরের ভেতর রান্না করতে তোদের একটুও বিরক্তি আসে না নাকি?

দূর ছাই, চুলোর উপরে তেলটা কখন থেকে ফুটছে তো ফুটছেই। বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে মনোয়ারা। কী দরকার পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটাঘাঁটি করে ; জীবনটা তো তার

রান্না করেই গেল। তবুও কি সে খাইয়ে কোনোদিন সন্তুষ্ট করতে পেরেছে? তেল হয়েছে তো মসলা হয়নি। মসলা হয়েছে তো নুন বেশি পড়ে গেছে। নিত্যনতুন অভিযোগ।

হ্যাঁ, নূতন নূতন জিনিস পাক করতে আমাদের খুব ভালো লাগে। জামানকে রাগাবার জন্যই কথাটা বলেছিল মনোয়ারা।

দম বন্ধ করে ফুলতে লাগল জামান। তারপর একসময় চিৎকার করে বেরিয়ে গেল—বছরে বছরে ছেলের মা হতেই আসলে তোদের ভালো লাগে।

অন্যায় কিইবা বলেছিল জামান। একটা কেন? এইতো সে-বছর দুটোই হয়ে বসল তার। এ নিয়ে সবাই হাসাহাসি করল। হাসুক ওরা। কী আছে তাতে মনোয়ারার? খোদা যদি দেয়, মনোয়ারা কী করতে পারে তাতে? হ্যাঁ খোদা কম দেয়নি তাকে এই ক'টি বছরে; মোট ছ'টি দিয়েছে। সন্তান বেড়েছে, কিন্তু আয় বাড়েনি। যে একশ' পঁচিশ সেই একশ' পঁচিশই রয়ে গেছে। মনোয়ারা যদি চাকরি করতে পারত তাহলে হয়তো সংসারটা কিছু সচ্ছল হয়ে আসত। কিন্তু, ঘর সামলাবে, না বাইরে চাকরি করতে যাবে মনোয়ারা? কোন্‌টা করবে?

জামান বলেছিল কী একটা দেশের কথা, সেখানে নাকি ছেলেমেয়েদের কিন্ডারগার্টেন না কিসে রাখা হয়। আর মা-বোন বেরিয়ে যায় কাজে। সে রকম হলে মন্দ হত না হয়তো।

আবার ভাবনার অতলে ডুবে পড়ল মনোয়ারা।

সেই যে সকালে বেরিয়ে গেল লোকটা, রাত দশটার আগে ফিরল না। দোরগোড়ায় মনোয়ারার সাথে একেবারে মুখোমুখি।

রাগ পড়ল তো? মুচকি হাসল মনোয়ারা।

ফাজলামো করিসনে, বুঝলি? হাতের বান্ডিলটা টেবিলের উপর রাখল জামান।

ওগুলো আবার কি? বান্ডিলটা হাতে নিয়ে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলল মনোয়ারা, অনেকগুলো ফটো, দেশ-বিদেশের মেয়েদের।

ওগুলো তোর জন্য এনেছি দেখ—একবার দুটো চোখ দিয়ে ভালো করে দেখ। মনোয়ারার ঘাড়ের উপর একখানা হাত রেখে, ওর দৃষ্টিকে ফটোগুলোর উপর আরো নত করে বলেছিল জামান—তোদের মতো ওদেরও ঘর-সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে; কিন্তু সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ওরা কত উন্নত একবার দেখে নে।

সত্যি অবাক হয়েছিল মনোয়ারা। শুধু অবাক নয়। প্রেরণা এসেছিল ওর অবচেতন মনের প্রতিটি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ওদের মতো হবার জন্য। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই কি আর এ-দেশে সব কিছু করা যায়। মাথার ওপর বাপ-মা রয়েছে, আর রয়েছে সমাজ।

তরকারিটা নামিয়ে নিয়ে, ডালের কড়াইটা তুলে দিল মনোয়ারা। না একটু ভালো করে ভাবতে পারবে তারও উপায় নেই। জামানেরও বা চলে যাওয়া ছাড়া আর কী উপায় ছিল?

ও তো কম করেনি মনোয়ারার জন্য। ওরই উৎসাহে মনোয়ারা লিখতে আরম্ভ করেছিল—গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা। প্রথম প্রথম লেখায় একটু জড়তা ছিল বই কী। তাও কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল সে জামানের প্রচেষ্টায়। উহ্‌! সেদিনটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না মনোয়ারা। তার প্রথম লেখা, প্রথম গল্প যেদিন ছাপার অক্ষরে পত্রিকায় প্রকাশিত হল। চারদিক থেকে প্রশংসাপত্র এল, চমৎকার গল্প। বলিষ্ঠ লেখনী। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

জামান বলল—দেখ তোর ভেতর এমন একটা প্রতিভা ঘুমিয়ে আছে, তা কি তুই জানতি? আসলে, সবকিছুর মূলে ওই চেষ্টা থাকা চাই, সাধনা করতে হয়, তাহলেই প্রতিভা বিকাশ পায়, বুঝলি। কিন্তু, বুঝেও কী করতে পারল মনোয়ারা? আর লিখতে পারেনি সে, লিখতে পারবেও না। প্লট আসে ; ভালো ভালো প্লট, কিন্তু—

মা, ভাত দেবে না? স্কুলের যে সময় হয়ে এল।

শুধু খাই, খাই খাই।

নে, খা। ভাতের গামলাটা ছেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে, কাপড়ের আঁচলে মুখের ঘাম মুছল মনোয়ারা। ভোর না-হতেই স্কুলের-অফিসের তাগিদ। দু-হাতে কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারে না সে। হাঁফিয়ে উঠে, মাথা ঘুরায় ; শরীরে ক্লান্তি নেমে আসে। তবুও রেহাই নেই, নিস্তার নেই, করতেই হবে।

দেখো জামান, তুমি আমার ভাগনে, অতি আপনার জন, তোমাকে আর কী বলব, অবুঝ নও তুমি।

সেদিন মামার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল জামান। তারপর বলেছিল—কেন কী ব্যাপার মামা।

মানে, লোকে কী সব আজেবাজে কথা বলাবলি করছে।

আজেবাজে কথা!

হ্যাঁ, বোঝো তো ঘরে বয়স্কা মেয়ে থাকলে, অনেকেই অনেক কথা বলে, তাই বলছিলাম—

কথাটা আর শেষ করেননি তিনি। হয়তো শেষ কথাটা উচ্চারণ করতে ভদ্রতায় বাঁধছিল তার। কিন্তু মনোয়ারার দাদী ওসব ভদ্রতার ধার ধারেন না। তাই সহজ এবং সরল ভাষায় তিনি বলেছিলেন—ন্যাকামো! আরে জামান বুঝতে তো পাচ্ছ সবই।

এবার সব সত্যিই বুঝল জামান। ছোট্ট চামড়ার সুটকেসটাকে হাতে নিয়ে নির্বিকারভাবে বেরিয়ে গেল সে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল তখন, সে বৃষ্টির ভেতর ভিজেই চলে গেল। কেউ বাধা দিল না, এমনকি মনোয়ারাও না। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল সে। চোখের পলকগুলো কি ভিজে উঠেছিল মনোয়ারার? নইলে অমন আঠা আঠা লাগছিল কেন চোখের চারপাশটা।

তারপর—একটা বছর না ঘুরতেই বিয়ে। নূতন জীবন। নূতন করে ঘর বাঁধবার দিন। স্বামীর বলিষ্ঠ দেহের সবল পেশির ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলার পালা। তারপর

এক ঝড়ো রাতে আকস্মিকভাবেই খবরটা শুনল মনোয়ারা—জামানকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, আর কিছুদিন পরেই শুনল ওকে আন্দামান না কোথায় চালান দেওয়া হয়েছে। খবরটা শুনে খুবই দুঃখ হয়েছিল তার। কিন্তু ভাববার অবসর পায়নি সে। কারণ আবুল তখন সাত মাসের। তাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল সে।

কিন্তু আজকাল প্রায়ই ভাবনায় পড়ে মনোয়ারা। সেই-যে লোকটাকে নিয়ে গেল ওরা। আজও সে ফিরে আসেনি। দেশ স্বাধীন হবার পরেওও না। তবে কি ওকে ওরা মেরে—

মা, মাগো, দেখো না আবুল ভাই ওরা বিকেলে আরমানিটোলা মিটিঙে যাচ্ছে, আমায় নেবে না বলছে। মা আমি যাব—। মা আমি যাব—। মেয়ে সেলিনা এসে গলা জড়িয়ে ধরেছে তখন।

ধিঙ্গি মেয়ে, আজ বিয়ে দিলে কাল ছেলের মা হবে, পুরুষদের মিটিঙে রূপ দেখাতে যাবেন উনি। মেয়ের মুখের উপর খুন্তি নাড়ে মনোয়ারা।

কেন, মেয়েদের বুঝি সভা-সমিতিতে যেতে নেই? আমি যাব। সেলিনা গোঁ ধরে।

অবাক মনোয়ারা! বড্ড বেশি অবাক। জামানের কথা, ঠিক জামানের কথাটাই ধ্বনিত হয়েছে সেলিনার কণ্ঠে। কিন্তু কোত্থেকে এসব শিখছে ও। কেমন একটা অজানা আক্রোশে সারা শরীর ফুলতে থাকে মনোয়ারার। দু-হাতে মেয়ের দু-কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আজকাল দজ্জাল মেয়েদের সঙ্গে মেশা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পটাপট থাপ্পড় পড়ে মেয়েটার গালে।

কিন্তু আবার অবাক হতে হয় মনোয়ারাকে। সেলিনা সরে দাঁড়ায় না এক পাও। বোবা চোখে সে তাকিয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে—কী এমন অন্যায় দাবি তার বুঝতে পারে না। মনোয়ারার উদ্যত হাত মাঝপথেই থেমে যায়। সেলিনার আয়ত পানিভরা চোখে ঝড়ো মেঘের বিপ্লবী প্রতিজ্ঞার ছায়া কি ঘন হয়ে উঠছে না!

না, না, এ কী করছে সে। কেন, কেন, কী অধিকার তার রয়েছে এ পরিবর্তনকে অস্বীকার করার? দূরে বহু দূরে কোনও নির্জন দ্বীপের নিরালা তটে যেন একটা স্বপ্নমাখা আবছা শৃঙ্খলিত মূর্তি তার চোখে ভেসে ওঠে!

না, না, সে স্বীকার করবে একে—এই পরিবর্তনকে, এই বিপ্লবী ঝড়ো হাওয়াকে। ছুটে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। দেহটা থেকে-থেকে দমকে দমকে কাঁপতে থাকে তার।

অতি পরিচিত

অসংখ্য বই-পুস্তকে সাজানো ট্রলির বাবার লাইব্রেরি। দেখে অবাক হল আসলাম। সত্যি, বাসায় এতবড় একখানা লাইব্রেরি আছে, ট্রলি তো এ কথা ভুলেও কোনোদিন বলেনি তাকে।

একটু হাসলেন ট্রলির বাবা। বললেন, দৈনিক কমপক্ষে ঘণ্টা আটেক এখানেই কাটে আমার। রীতিমতো একটা নেশা হয়ে গেছে। কেবল পড়া পড়া আর পড়া। জীবনটাই বই পড়েই কাটালাম।

লিনেনের শার্ট আর ট্রপিকেলের প্যান্ট পরা সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক। যুগল ভ্রু-জোড়ার নিচে তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। কপালে বার্ধক্যের জ্যামিতিক রেখা। কেন জানি প্রথম সাক্ষাতেই ভদ্রলোকের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেল আসলামের। মেহগিনি কাঠের রঙিন সেল্ফ থেকে মরক্কো লেদারে বাঁধাই মাসিক 'মাহে নও'য়ের বাৎসরিক সংকলনখানা নামিয়ে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভদ্রলোক আবার বলেন, কিন্তু, একটা কথা কি জানো আসলাম। এদেশে শিক্ষার কোনো কদর নেই।

শিক্ষা আছে যে তার কদর থাকবে? বাবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওপাশ থেকে উত্তর করল ট্রলি।

ট্রলির সাথে আসলামের পরিচয় আজকের নয়। বছরখানেক আগের। ভার্সিটির লনে, প্রথম পরিচয়-মুহূর্তে কোনো এক মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে ট্রলি বলেছিল, আমি তার ভাগনী।

মন্ত্রীর ভাগনী? মানে আপনার মামা মিনিস্টার? প্রথমটায় অল্প একটু অবাক হয়েছিল বই কী আসলাম।

সরু ঠোঁটের ওপর লিপস্টিকের ডগাটা নিখুঁতভাবে বুলিয়ে নিয়ে ট্রলি বলেছিল, জি হ্যাঁ। আমার এক মামা মিনিস্টার। আর-এক মামা এ্যামবাসিডার।

মামা যার মিনিস্টার, দুনিয়া তার তামার মতোই উজ্জ্বল বলে জানত আসলাম। তাই বলেছিল, আপনার বাবাও কি তাহলে—।

না না ওসব মন্ত্রীগিরির মধ্যে বাবা নেই। তিনি আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করেন। ট্রলি বলেছিল।

বাবা ব্যবসা করেন। মামা মিনিস্টার। সত্যি কেন যেন সেদিন বড্ড ভালো লেগেছিল ট্রলিকে।

ফিনফিনে বাতাসের ভেতর বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ট্রলির বাবা বললেন, জানো আসলাম এই-যে গাড়ি বাড়ি আর ধনদৌলত দেখছ, এসব কিছু স্রেফ ব্রেইন দিয়ে আয় করা।

ভাষাটা দ্রষ্টব্য না হলেও ঠিক বোঝা গেল না। কপালে বিস্ময়ের ঢেউ তুলে আসলাম তাকাল ট্রলি আর তার বাবার দিকে।

মুখ টিপে হাসল ট্রলি।

হাসলেন ট্রলির বাবা।

দিনটা ছিল রোববার। আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে বসে কী একটা মার্কিনি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল ট্রলি। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কৈফিয়তের সুরে প্রশ্ন করল, এতদিন আসোনি যে?

আসব কেমন করে বলো। তোমার মামা যে ঘর থেকেই বেরুতে দিলেন না এ কয়দিনে।

তার মানে?

মানে একশ' চুয়াল্লিশ আর কারফিউ।

ও! ভ্রু-জোড়া নেচে উঠল ট্রলির।

হঠাৎ বলে উঠল আসলাম, আচ্ছা ট্রলি, তুমিই বলো। এতগুলো নিরীহ ছেলেকে গুলি করে মারা কি উচিত হয়েছে?

হুঁ, কী বললে? বই থেকে মুখ তুলল ট্রলি।

ওই গুলি ছোড়ার কথা বলছিলাম। তুমি কি কোনো খোঁজ রাখো না ট্রলি?

রাখি। মাথা দুলিয়ে বলল ট্রলি, যদি বলি গুলি ছোড়াটা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে তাহলে?

হ্যাঁ তাহলে? দোরগোড়া থেকে গম্ভীর গলায় বললেন ট্রলির বাবা। আসলে কি জানো আসলাম, এদেশের ছেলেমেয়েগুলো সব গোল্লায় গেছে। উচ্ছন্নে গেছে সব। নইলে ইসলামি ভাষা ছেড়ে দিয়ে ওই কুফুরি ভাষার জন্য এত মাতামাতি কেন? কথা তখনও শেষ হয়নি ট্রলির বাবার। ইসলামি দেশে ইসলামি ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই। টেবিলে একটা প্রচণ্ড ঘুসি পড়ল তার। দ্যাখো আসলাম আমি যা-কিছু বলি থরো স্টাডি করেই বলি। আমি বলছি তোমায়। অনেক স্টাডি করে আমি দেখেছি। বাংলা ভাষার নিজস্ব ঐতিহ্য বলতে কিছুই নেই।

একেবারে থিং। নট এ সিংগল ফার্দিং। বাবার সাথে তাল মিলিয়ে বলল ট্রলি। প্রতিবাদে কী বলতে যাচ্ছিল আসলাম। থামিয়ে দিল সে। হয়েছে থাক। চুপ করো তোমার মাথায় শয়তান বাসা করেছে। ওগুলো তাড়াতে হবে। ওঠো, উপরে চলো।

টেনে তাকে উপরে নিয়ে এল ট্রলি। বসো, জোর করে চেপে বসিয়ে দিল চেয়ারের উপর। তারপর বৈদ্যুতিক পাখাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল সে। মাথার এলোমেলো চুলের ভেতর পরম আদরে ওর নরম আঙুলগুলোকে বুলিয়ে দিয়ে ট্রলি বলল, তুমি এরকমটি হবে তা কোনোদিনও ভাবতে পারিনি আসলাম। ঠোঁটের কোণে একটুকরো করুণ হাসি ট্রলির।

ট্রলির বাবার পুরনো চাকরের সাথে আলাপ হল বৈঠকখানায়। বুড়োকে দেখে কেন যেন জর্জ বর্নাড শ'র কথা মনে পড়ে গেল আসলামের। সুদূর বিলেতের মৃত বর্নাড শ'র সাথে অদূর রমনার এই বুড়ো ভৃত্যের আকৃতিতে সামঞ্জস্য সত্যি বড় অদ্ভুত ব্যাপার।

কৌতূহলবশেই হয়তো জিজ্ঞেস করে আসলাম, কতদিন আছ এখানে?

তা সাহেব অনেক দিন। বুড়ো হেসে বলল, সেই যুদ্ধের আমল থেকে।

বল কিহে। সে তো বছর দশেকেরও বেশি।

হ্যাঁ সাহেব। বছর দশেকের মতোই প্রায়। বুড়ো বলল, তখন কিন্তু এদের অবস্থা অত ভাল ছিল না। কলকাতায় সার্কুলার রোডের উপর রেশনের দোকান ছিল একটা। গলাটাকে একটু খাঁকড়ে নিল বুড়ো। এখন যা কিছু দেখলেন—এসব তো পাকিস্তান হবার পরেই—। কথাটা শেষ করতে পারল না সে। ভেতর থেকে ট্রলির ডাক পড়তেই ভেতরে চলে গেল।

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর, ভার্সিটির লনে আবার দেখা হল ট্রলির সাথে।

কেমন আছ ট্রলি? জিজ্ঞেস করল আসলাম।

এই এক রকম। ট্রলি বলল, আগামী মাসে বিলেত যাচ্ছি।

কেন, হঠাৎ? ট্রলি বলল, তুমিতো জানো, মেজ আপা ওখানেই আছেন। তাঁর বাসায় কিছুদিন বেড়াব। তারপর সেখান থেকে যাব কালিফোর্নিয়াতে বড় আপার কাছে।

ফিরছ কখন?

বলতে পারছি না সঠিক! টানা চোখের ভ্রু-জোড়া নেচে উঠল ট্রলির। বলল, বড় আপা গিয়ে আর ফেরেননি। ওখানেই বাসাবাড়ি করে রয়ে গেছেন। মেজ আপার অবস্থাও প্রায় সেরকম হতে চলেছে। আমারও হয়তো—

কথাটা শেষ করল না ট্রলি। কেন যেন হঠাৎ থেমে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, সময় করে একবার বাসায় এসো—তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে।

আরেকদিন কী একটা কাজে রাস্তায় বেরিয়েছিল আসলাম। পেছন থেকে ট্রলির কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে দাঁড়াল। কেডিলাকের হুইল ধরে বসে আছে ট্রলি। কাছে আসতেই বলল, খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছ।

কোন খবর? অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সে।

কেন, আজকের কাগজ পড়োনি? ট্রলি অবাক হল।

না এখনও পড়িনি।

পড়োনি? তাহলে মোটরে ওঠো। একটু অবাক করিয়ে দিই তোমায়। জোরে হেসে উঠল ট্রলি।

বাসার সামনে অসংখ্য মোটরের সার দেখে সত্যি অবাক হল আসলাম। বলল, কী ব্যাপার ট্রলি?

বুঝতে পারছ না কিছু? ট্রলির চোখে রহস্যঘন হাসি। ট্রলি হেসে বলল, বাবা শিগ্রী সেন্ট্রালের এডুকেশন বিভাগের বড়কর্তা হয়ে যাচ্ছেন। বুঝলে?

ও, তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই, ট্রলি বলল। তোমাদের পছন্দ হবে তো?

নিশ্চয়ই হবে। তাঁর মতো একজন ইন্টেলেকচুয়াল লোক—

কথাটা কেন যেন গলায় আটকে গেল। ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি তুলে ট্রলি বলল, একটা দরখাস্ত লিখে রেখোতো আসলাম। বাবার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির দরকার হতে পারে। আমি তোমায় রিকমেন্ড করে দিয়ে যাব। বুঝলে?

মোটর থেকে নামতেই ট্রলির বাবাকে দেখা গেল। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত তিনি। তাই হয়তো আসলামের উপস্থিতি তাঁর চশমায় ঘেরা চোখে ধরা পড়ল না সহজে।

ট্রলি বলল, লাইব্রেরিতে গিয়ে বসো তুমি। আমি একটা কাজ সেরে আসি। কেমন? বলে উপরে চলে গেল সে।

সেল্ফ থেকে একটা বই নামিয়ে পড়তে বসল আসলাম। রবিঠাকুরের গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ।

কে, আসলাম? ট্রলির বাবার চমকে-ওঠা কণ্ঠস্বরে বই থেকে মুখ তুলে তাকাল সে। কখন এলে তুমি? উচ্ছ্বসিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন ট্রলির বাবা।

এইতো মিনিট পনের আগে। ধরা গলায় উত্তর দিল আসলাম।

কী পড়ছ ওটা? আরো কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর বইটার উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, ও গীটাঞ্জলী? এ নাইস, নাইস বুক। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন দেশের ভাবী শিক্ষাকর্তা, ট্রলির বাবা। বললেন, গীটাঞ্জলী, ওহ্! চমৎকার বই! মিলটনের একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

ইচ্ছা অনিচ্ছা

কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ে নড়বড়ে চালাঘরটা ধসে পড়ল মাটিতে। বিন্তি জানত না সে খবর।

মিয়াবাড়িতে ধান ভানতে গিয়েছিল সে। ফিরে আসতেই রাস্তায় মনার মা বলল, তখনই কইছিলাম বৌ ঘরডারে একটু মেরামত করো। তা তো কইরলা না, এখন—

এহন কী অইছে বুয়া? শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিন্তি। মনার মা বলল, কী আর অইবো বাপু। ঘরটা পইড়া গেছে তুফানে।

পইয়া গেছে? ইয়া আল্লা! হাত পাগুলো সব ভেঙে এল বিন্তির । করুণ কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল সে। তিনডা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কোন্হানে যামু আমি। কেমন কইরা ঠিক করমু ওই ঘর? আল্লারে—আল্লাহ্!

বিন্তির কান্নাটা বুকে বড় বিধল মনার মার। কী আর কইরবা বৌ। খোদার কাছ থাইকা দুঃখই আনছো; দুঃখই টানতে অইবো জীবনভর। বলে এটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। সোয়ামীটাও অকালে মারা যাওনে, আহ্, তোমার এত দুর্দশা।

তার কথা আর কও ক্যান বুয়া। হে যেইদিন মরছে হেইদিন থাইকাই তো ভাঙছে এ পোড়া কপাল। কথা শেষে কান্নার বেগটা আরো একটু বাড়ল বিন্তির। আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মনার মা। কথায় কয়, সোয়ামী নাই যার দুনয়াই আন্দার তার।

স্বামী অবশ্য এককালে ছিল বিন্তির। হাসিখুশি ভরা মানুষ। শক্তসামর্থ্য দেহ। বিন্তিকে কতই না ভালোবাসত সে। হাটে গেলে রোজ ঠোঙায় করে চার পয়সার বাতাসা কিংবা দু পয়সার ডালমুট নিয়ে আসত বিন্তির জন্যে। আদর করে হাতের মুঠায় পুরে দিয়ে কানে কানে বলত, সোনাদানা কিছু নাই, আর কী দিমু তোরে। আল্লা মিয়ায় গরিব কইরা বানাইছে মোরে। তারপর—

একদিন অকস্মাৎ জ্বরে পড়ল সে। টিপরা রাজার দেশে পাহাড়ে বাঁশ কাটতে গিয়েছিল শীতের মৌসুমে। ফিরে যখন এল তখন ম্যালেরিয়ায় হাড্ডিসার হয়ে গেছে আবুল। দেখে প্রথমে আঁতকে উঠেছিল বিন্তি। ইয়া আল্লা, এই কালব্যামোয় কেমন কইরা ধরল তোমারে। কেমন কইরা এই অবস্থা অইল তোমার।

কথা কইও না বৌ। কথা কইবার পারি না। জলদি গায়ে কাঁথা চাপা দে।

জ্বরে তখন ঠকঠক করে কাঁপছিল আবুল। চাটাইয়ের ওপর শুইয়ে দিয়ে গায়ে ওর কাঁথা চাপা দিল বিন্তি।

বিপদ আসে তো সব দিক দিয়েই আসে।

মিয়াবাড়িতে তখন ধানভানার কাজ করত বিন্তি। তিনমণ ওজনের ঢেঁকি; ঘন্টাখানেক ভানতেই পায়ে ব্যথা করে ওঠে। শরীর অবশ হয়ে আসে। হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হতেই

পা পিছলে পড়ে গিয়ে কপাল আর পায়ে ভীষণ আঘাত পেল বিন্তি। হাঁটুর নিচেটা অসম্ভব রকম ফুলে গেল দেখতে-না-দেখতে।

পুরো সাতটি দিন আতুরের মতো ঘরে বসেছিল সে। আবুলের তখন শেষ অবস্থা। জ্বরের ঘোরে যা-তা বকতে শুরু করেছে সে। একফোঁটা পথ্য কি ঔষুধ কিছুই ছিল না ঘরে। আবুল মারা গেল।

ওর মৃত্যুতে উঠানে গড়াগড়ি দিয়ে অসম্ভব কেঁদেছিল বিন্তি। পাগলের মতো চিৎকার করে কেঁদেছিল সে।

পাড়াপড়শিরা সান্ত্বনা দিয়েছিল। কাইন্দা কি অইবো আবুর বৌ। কাঁদলে কি আর আবুরে ফিরা পাইবি?

এত কান্দিস না বৌ। কান্দলে পর খোদা রাগ করবো। বিন্তির দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে বলেছিলেন বুড়ো কাসেম মোল্লা। খোদার মাল, খোদা নিয়া গেছে। তাতে কাইন্দবার কী আছে। কাইন্দা কী লাভ? হের থাইকা সোয়ামীডার যাতে পরকালে সদগতি অয় তার চেষ্টা কর। দুই-চারডা মোল্লা ডাইকা খতম পড়া। কিছু দান-খয়রাত কর।

দান-খয়রাত করতে অবশ্য কার্পণ্য করেনি বিন্তি। ইহকালের মাটিতে শুধুমাত্র দু-পয়সার কুইনাইনের অভাবে স্বামীকে বাঁচিয়ে না রাখতে পারলেও স্বামীর পরকালীন সুখ-শান্তির জন্য যথাসাধ্য ব্যয় করেছে সে। সে সব দীর্ঘ পাঁচবছর আগের কথা।

মাটিতে থুবড়ে-পড়া কুঁড়েটার সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনের ঘটনাগুলোই চোখের ওপর বুলিয়ে নিচ্ছিল বিন্তি।

মনার মা বলল, ভাবনাচিন্তা কইরা আর কী কইরবা বৌ। ঘরটা কেমনে মেরামত কইরবা এহন সেই চেষ্টা কর। কাচ্চাবাচ্চাগুলারে নিয়াতো আর উঠানে রাইত কাটান যাইবো না।

মনার মার কথায় ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল বিন্তি।

না-না আইজ রাইতের লাইগা চিন্তা নাই। আইজ রাইতটা না অয় আমার ঘরেই কাটালো। সহানুভূতির সাথে বলল মনার মা।

বাড়ির মুরুব্বি মনু পাটারী বলল, দুঃখ করিস না বিন্তি। খোদায় যা করে ভালার লাইগাই করে। জানের উপর দিয়া আইছিল, মালের উপর দিয়া গেছে। কিছু দান-খয়রাত কর তুই, দুই-চাইরডা মোল্লা ডাইকা খতম পড়া।

হ-হ তাতো কইরবই। খোদার কামে গাফেলতি করণ ঠিক না। মনুকে সমর্থন জানাল মনার মা।

সে রাতটা, মনার মার ছোট্ট কুঁড়েতেই ছেলেপিলে নিয়ে কাটাল বিন্তি।

পরদিন ভোর-সকালে বড়মিয়ার দোরগোড়ায় ধরনা দিল সে।

বড়মিয়া পাকা পরহেজগার লোক। দু-দুবার মক্কায় গিয়ে হজ্জ্ব করে এসেছেন তিনি। বিন্তির দুঃখের কথা শুনে বললেন, আবু বড় ভালা মানুষ আছল বিন্তি। তুই তার বৌ। তোরে সাহায্য করমু না কারে করমু।

বিন্তির হাতের বালাজোড়া, লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে ; তাকে একটা পাঁচটাকার নোট বের করে দিলেন বড়মিয়া। সময়মতো টাকাগুলা ফেরত দিয়া তোর জিনিস তুই নিয়া যাইস। কেমন?

মহাজনি কারবার করেন বড়মিয়া। তবে, সুদ খান না। সুদের নাম কেউ নিলে, গালে চাটি মেরে সাতবার তওবা পড়ান তাকে। লোকে অলঙ্কারপত্র বন্ধক রাখে। বড়মিয়া দু-চার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন তাদের। তবে, শর্ত আছে একটা। মাস তিনেকের মধ্যে টাকা শোধ না দিতে পারলে; অলঙ্কারগুলো বড়মিয়ার হয়ে যায়। মালিকের তাতে কোনো অধিকার থাকে না। আর—তাই বড়মিয়ার লোহার সিন্দুক দিনদিন ভর্তি হয়ে আসে।

বালা বন্ধক রেখে আনা টাকা দিয়ে ভাঙাঘর মেরামত করল বিন্তি। পুরনো খুঁটি, পুরনো খড় আর পুরনো বেড়াগুলোকেই জোড়াতালি দিয়ে নূতন করে দাঁড় করাল কোনো রকমে।

ঘরটা মেরামত করতে করতে সঈদ কামলা বলল, আরো কিছু টাহা খরচ কইরলে ভালা অইতো আবুর বৌ। এই জোড়াতালি দেয়া ঘর তুফান আইলেই তো আবার পইড়া যাইবো।

কী করমু চাচা। অসহায় ব্যাকুলতায় হু হু করে কেঁদে উঠল বিন্তি। খোদা, খোদাই ভরসা আমার।

তাতো ভালাই কইছ বৌ। খোদাইতো সব। খোদায় ইচ্ছা কইরলে সুখ দিবার পারে মানুষেরে, ইচ্ছা কইরলে দুখ। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সঈদ কামলা।

মনার মা বলল, আহা—কথায় কয় মাটি দিয়া বানাইছো খোদা মাটির নিচে দিবা। বেহেস্ত কি দোজখ তুমি; তোমার ইচ্ছামতো দিবা।

করিম মোল্লা বোধ হয় বিকেলে হাট করতেই বেরিয়েছিলেন।

বিন্তির নূতন ঘরটার দিকে চোখ পড়তে, দরদ-ভেজা কণ্ঠে বিন্তিকে ডেকে বললেন, আবুর বৌ, খোদারে ফাঁকি দিও না। দু-চারজন মোল্লা ডাইকা নূতন ঘরে মিলাদ পড়াও। নইলে ঘরের ভিটি পাকা অইবো না।

মিলাদ পড়ানোর কথাটা বিন্তিও ভাবছিল মনে মনে।

নূতন ঘর উঠলে মিলাদ পড়ানো রেওয়াজ। মিলাদ না পড়লে ঘরে ফেরেস্তা আসে না। আর, যে-ঘরে ফেরেস্তা আসে না, সে-ঘরের উন্নতি নেই; স্থায়িত্ব নেই—তা ভালো করেই জানে বিন্তি। তাই, আবার বড়মিয়ার দোরগোড়ায় হাজির হল সে।

মিয়াগিন্নি ছমিরন বিবি তখন উঠানে ধান শুকাচ্ছিলেন বসে বসে। আর বারবার করে তাকাচ্ছিলেন আকাশের দিকে। বৈশাখের আকাশ—এই রোদে ভরা, আর এই মেঘে ঢাকা। কোথায় থেকে যে হঠাৎ এত মেঘ এসে হাজির হয় তা ভাবতে অবাক লাগে ছমিরন বিবির। তাই, একসাথে ধান আর আকাশ দুটোকেই পাহারা দিচ্ছিলেন তিনি বসে বসে। মেঘ দেখলেই ধানগুলো ঝটপট ঘরে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন এই ইচ্ছে তাঁর।

বিন্তির দুঃখের কথা শুনে বড় আফসোস করলেন ছমিরন বিবি। আহা তোর কপালডা তুই খাইবার আছস বিন্তি। কইলাম, ছেইলা মাইয়াগুলারে কারো হাওলা কইরা দিয়া কারো সঙ্গে 'সাঙ্গা' বইয়া যা তুই। যৈবন এহনো টলটল কইরবার আছে তোর গায়। সাঙ্গা বইতি চাইলে তুই হাজার জনে এহন সাঙ্গা করতে চাইবো তোরে। ক্যান বেহুদা নিজেরে শুকাইয়া মইরবার আছস তুই।

ছমিরন বিবির কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বিন্তি। তারপর বলল, না আম্মাজান মইরা গেলেও সাঙ্গা বইমু না কারো কাছে। তাইলে ছেইলা মাইয়াগুলা আমার উপাস মরবো।

এর উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন ছমিরন বিবি। হঠাৎ চোখ পড়ল তার আকাশের দিকে। দক্ষিণ থেকে একটা বিরাটকায় কালো মেঘ উঠে আসছে আকাশে। ওরে ও বিন্তি। আমার ধানগুলারে একটু ঘরে তুইলা দে। জলদি কর জলদি কর, বৃষ্টি যে আইয়া পড়ল।

মিয়াগিন্নির ধানগুলো ঘরে তুলে দিয়ে, কাপড়ের আঁচলে ঘাম মুছে নিয়ে সসঙ্কোচে বড় মিয়ার সামনে গিয়া দাঁড়াল বিন্তি। কয়ডা টাহা ধার দেন হুজুর।

ধার দিতে কী আমার কোনো আপত্তি আছেরে আবুর বৌ। আমার কি কোনো আপত্তি আছে। সাদা দাড়িগুলোতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন বড়মিয়া। কিন্তুক, কিছু একডা তো বন্ধক রাইখতে অইবো তোরে। এমনে কেমন কইরা টাকা দেই।

আমার কাছে একডা তামার বাটিও নাই হুজুর। জোড়হাতে অনুনয় করল বিন্তি। কয়ডা টাহা দেন।

কইলাম তো কিছু বন্ধক না রাইখলে টাহা দিবার পারমু না।

তাইলে আমার কী অইবো হুজুর। আমার কী অবস্থা অইবো। বিন্তি কেঁদে উঠল এবার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কী যেন ভাবলেন বড়মিয়া। তারপর বললেন, তোর ঘর ভিটিটাই না অয় বন্ধক রাখ না আমার কাছে।

তা কেমন কইরা অয় হুজুর। বড়মিয়ার আকস্মিক প্রস্তাবে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল বিন্তি। ভিটেবাড়ি বন্ধক রাখবে এ কেমনতরো কথা? বিন্তিকে এ নিয়ে চিন্তা করতে দেখে অভিমানাহত হলেন বড়মিয়া। এতে এত চিন্তা কইরবার কী আছে বিন্তি। আমি কি কোনোদিন তোগো কোনো খারাবি করছি। না করবার চাই?

না-না তা ক্যান কইরবেন হুজুর। তা ক্যান কইরবেন। বাধা দিয়ে বলল বিন্তি। আপনে আমাগো মা-বাপ।

বিন্তির কথায়, দরদ যেন উছলে পড়ল বড়মিয়ার কণ্ঠে। তোরে বিনা-বন্ধকেই কিছু টাহা ধার দিবার ইচ্ছা আছিল বিন্তি। কিন্তু, হায়াত মউত তো কায়েম না। হাওলাত বরাত রাইখা মইরা গেলে কেয়ামতের দিন দায় দিবার লাগবো। তাই কইবার আছিলাম— বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বড়মিয়া। আল্লার কুদরতের শান কে বুঝবার পারে! তোর মতো গরিব দুঃখীদের বাঁচাইবার লাইগাইতো আল্লায় আমাগো মতো দুই-চাইরজন বড় মানুষেরে পাঠাইছে দুনিয়ার পরে। কথা-শেষে তছবি পড়ায় মন দিলেন বড়মিয়া।

দ্বিমত করিছ না বিন্তি, রাজি অইয়া যা। বড়মিয়ার হয়ে ওকালতি করলেন সুলতান মৌলভী। আল্লার ওলি মানুষ একডা কথা কইছে, কথাডা ফালাইস না। বদদোয়া লাগবো।

বদদোয়াকে ভীষণ ভয় করে বিন্তি। খোদাভক্ত, পরহেজগার মানুষের বদদোয়া বড় সাংঘাতিক জিনিস। বিন্তির মনে আছে—এ গাঁয়ের কেতু শেখকে একবার বদদোয়া দিয়েছিলেন এক পীর সাহেব। সেই বদদোয়াতেই তো গোষ্ঠীসুদ্ধ লোপ পেল কেতুর। এক-এক করে সবাই মরল। এখন একেবারে ফাঁকা বাড়ি খাঁ খাঁ করে।

বদদোয়ার ভয়ে অগত্যা রাজি হয়ে গেল বিন্তি। একটা সাদা কাগজে কী সব লিখে, তার ওপর বিন্তির টিপসই নিলেন বড়মিয়া। তারপর একটাকার বারটা ময়লা নোট গুঁজে দিলেন ওর হাতে।

মোল্লা খাওয়ানোর সময়; মুরগির হাড্ডি চিবোতে চিবোতে বিন্তির রান্নার অজস্র প্রশংসা করলেন কাসেম মোল্লা। বললেন, আহা বড় স্বাদের রাঁধা রাঁধছ আবুর বৌ। বড় স্বাদের রাঁধা রাঁধছ।

সুলতান মৌলভী বললেন, আরো দু-এক টুকরা গোস্ত দাও না আবুর বৌ। কেপ্পনি কর ক্যান। খোদার কামে কেপ্পনি ভালা না।

ঠিক ঠিক। কাসেম মোল্লা সমর্থন জানালেন তাকে। খোদার কামে কেপ্পানি ভালা না বৌ। আমারে আর চাইরডা ভাত আর একটুহানি সুরুয়া দাও।

খাওয়া শেষে মিলাদ পড়লেন সবাই। বিন্তির জন্যে দোয়া করলেন অকৃপণ কণ্ঠে। তারপর, নূতন ঘরের চারকোণে চারটে তাবিজ পুঁতে ঘরময় পড়ানো পানি ছিটোলেন কাসেম মোল্লা।

ঘাবড়াইস না বিন্তি। খোদার উপরে আস্থা রাহিস। খয়রাতি পয়সাগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন সুলতান মৌলভী।

আকাশ বেয়ে তখন অসংখ্য কালো মেঘ অস্বাভাবিক গতিতে ছুটে চলেছে দূর দিগন্তের দিকে। বৈশাখ এখনও শেষ হয়নি।

ঝাঁপিটা লাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল বিন্তি। কালবৈশাখীকে আর কোনো ভয় নেই তার। ভয় নেই কোনো দুরন্ত ঝড়ের কঠোর ভ্রুকুটিকে। ঘরে ফেরেস্তা এনেছে সে। খোদার ফেরেস্তা। যে খোদা এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছে! যার ইঙ্গিতে চলছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠল বিন্তির মুখখানা।

মাঝরাতে হঠাৎ কিসের প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস হল না। কাসেম মোল্লার তাবিজ, সুলতান মৌলভীর পড়ানো পানি, খোদার ফেরেস্তা। সব কিছুর প্রতি এমন চরম উপেক্ষা; এ কোন্ শক্তি? ভাঙা হাতের কব্জিটাকে চেপে ধরে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আকাশের দিকে তাকাল বিন্তি।

সকালবেলা বড়মিয়ার মেজ ছেলেকে উর্দু পড়াতে যাচ্ছিলেন কাসেম মোল্লা। বিন্তির ভাঙা কুঁড়েটার দিকে চোখ পড়তে অনেক আফসোস করলেন তিনি। খোদা তোরে পরীক্ষা কইরতাছে বিন্তি। আহা—খোদার কুদরতের শান কে বইলবার পারে।

ছাগলে দাড়িগুলোর ভেতর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন তিনি। হয়তো কোনো বড় মুছিবত আছিল তোর ওপর। খোদায় ছোট্ট মুছিবত দিয়া পার কইরলেন সেইড্যা। ঘাবড়াইস না। এহন কান্নাকাটি কইরা খোদার কাছে মাপ চা। খোদার রাস্তায় কিছু খরচ কর। আহা খোদায় যা করে ভালার লাইগাই করে!

খোদায় যা করে ভালার লাইগাই করে। কাসেম মোল্লার দিকে তাকিয়ে কাঁপা ঠোঁটে অদ্ভুতভাবে হাসল বিন্তি।

জন্মান্তর

লোকটাকে এর আগেও ক'দিন দেখেছে মন্তু। হ্যাংলা রোগাটে দেহ; তেলবিহীন উস্কখুস্ক চুল। লম্বা নাক, খাদে ঢোকা খুদে খুদে দুটি চোখ। সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত দেহটা টেনে টেনে নবাবপুরের দিকে এগোয়। কদাচিৎ বাসে চড়ে।

বাস স্ট্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আপনমনে একটা আধপোড়া বিড়ি টানছিল আর লোকটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল মন্তু।

পঞ্জিকার হিসেবে মন্তু এবার পনের-এর ব্যূহ ভেদ করবে। অর্থাৎ নাবালকের ডিঙি থেকে সাবালকের ডাঙায় পা দেবে। বয়স সবে পনের হলেও নিদেনপক্ষে বার-পাঁচেক জেলের হাওয়া খেয়ে এসেছে মন্তু—মন্তু শেখ।

ভাবতে গেলে, জীবনটাই বড় অদ্ভুত মন্তুর।

আরও অদ্ভুত লাগে যখন সে নিজে বসে বসে তার ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা ভাবে।

সুখিয়াল স্বপ্নে-ভরা দিন।

তখন নেহায়েৎ বাচ্চা ছিল মন্তু। সূর্য উঠতেই ক্ষেতের আইলে বাবার জন্য হুঁকো আর পান্তা নিয়ে হাজির হত সে। বাবা জমিতে হালচাষ করতেন, মই দিতেন, আর ধান বুনতেন।

বছর শেষে যা ফসল ঘরে আসত, তা দিয়ে কোনো রকমে দিন চলে যেত ওদের।

বাবা বলতেন, মন্তুরে আবার লেখাপড়া শিখামু। ইসকুলে পাঠামু ওরে।

কী যে কও মিয়া? লেখাপড়ার আবার কদর আছে নাকি আজকাইল। নূরু চাচা বোঝাতেন বাবাকে। উয়ার চাইতে ক্ষেতের কাজ ভালা! ভালা কইরা চাষ কইরলে সোনা ফলে। মন্তুরে ক্ষেতের কাজ শিখাও।

না বাপু, তা অইবার নয়। মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়তেন বাবা।

বাবার চোখে স্বপ্ন ছিল।

সে স্বপ্ন ভাঙতে দেরি হল না।

তখন যুদ্ধের মওসুম। সৈন্যরা এসে জমিগুলো সব দখল করে নিল ওদের। সেখানে ঘাঁটি করবে ওরা। প্লেন ওঠানামার ঘাঁটি।

সৈন্যরা এল।

সাথে নিয়ে এল অসংখ্য ট্রাক, লরী আর বুলডোজার।

আরো যে-দুটো জিনিস সাথে করে এনেছিল ওরা, তা হল দুর্ভিক্ষ আর মহামারি।

দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে বাবা, মা, ভাই-বোন সবাইকে হারাল মন্তু।

গাঁও ছেড়ে দলে-দলে লোক ছুটছে শহরের পথে। সার-সার লোক চলছে তো চলছেই। তেমনি একটা দলের সাথে শহরে চলে এল মন্তু।

শহর নয়তো প্রেতপুরী। পথে ঘাটে, ডাস্টবিনে মৃতের ছড়াছড়ি। অলিতে গলিতে অসংখ্য ক্ষুধিতের মিছিল। সে মিছিলে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল মন্তু। এমনি সময় দেখা হল ওর জুলমত সিকদারের সাথে। শহরে তখন পকেটমারের এক বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছে জুলমত। মন্তুকে দেখে বলল, এখানে কেন পড়ে-পড়ে মরছিস বাপু। আরে আমার সাথে আয়। রোজগারের বন্দোবস্ত করে দেব।

জুলমতের কাছেই প্রথম হাতেখড়ি পড়ল মন্তুর। কালু, মতি, হীরা ওরাও ছিল ওর সাথে। মতি নাকি সম্প্রতি ব্যবসা ছেড়ে কোন এক মন্ত্রীর কনফিডেন্সিয়াল এ্যাসিস্টেন্ট হয়েছে। চালাক ছেলে বটে, লোকে বলে মানিকে মানিক চেনে। একেবারে খাঁটি কথা।

বিড়িটা শেষ হতে কায়দা করে সেটা নর্দমায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে চকের দিকে এগুতে লাগল মন্তু।

হোটেলে ঢুকে পেট ভরে ভাত খেয়ে নিল সে। তারপর ওহিদ আলীর পানের দোকান থেকে কিমাম দেয়া একটা পান মুখে পুরে আর একটা বিড়ি ধরাল।

কিরে মন্তু, আইজকা কিছু রোজগার অইল? ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল ওহিদ আলী।

আরে, মরদ কি কোনো দিন খালি হাতে ফেরে! মুখের কোণে গর্বের হাসি টেনে পকেট থেকে একটা ঝলমলে আংটি বের করে ওহিদ আলীকে দেখাল মন্তু।

বিস্ময়ে চকচক করে উঠল ওহিদ আলীর চোখ দুটো। মন্তু তখন আবার চলতে আরম্ভ করেছে।

আংটিটার জন্যে আজ সারাটি সকাল হয়রান হতে হয়েছে ওকে। বাব্বাঃ যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে। আংটি একটা কিনবে তো তিনঘণ্টা ধরে তিনশ তিরিশটা আংটি পরখ করে তারপর কিনল এটা। ছেলেটা বলল, নাও, হাতে পরে নাও তোমার।

না এখন না, পরে পরবো।

মেয়েটা বলল, কোটের পকেটে রেখে দাও তোমার।

মন্তুর বরাত! বরাত জোরই বলতে হবে। নইলে এই পকেটমারের যুগে কোটের পকেটে ভুলেও কেউ অলঙ্কার রাখে?

জেল রোডের মোড়ে এসে আংটিটাকে আর একবার পরখ করে দেখল মন্তু। উঁচু দেয়ালে ঘেরা জেলটার দিকে চোখ পড়তে পরম বিনয়ের সাথে জেলকে একটা সালাম ঠুকল সে।

জেল তার গুরু। এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

একবার জেলে গেছে তো পাচঁ-দশটা নতুন রকমের প্যাঁচ, নতুন রকমের কলা-কৌশল আয়ত্ত করে বেরিয়েছে সে। গুরু মানবে না কেন? গুরুই তো! গুরুকে আর একটা সালাম ঠুকল মন্তু। আংটিটা তখনও মুঠোর মধ্যে ওর।

পরীবানুর ছবিটা চোখের পাতায় ভেসে উঠছে এখন।

নবী সিকদারের লাল টুকটুকে নাতনী পরীবানু। একদিন এ আংটিটা আঙুলে পরেই মন্তুর পাশে এসে দাঁড়াবে সে। পরীবানু! পরীবানু নয়, ফুলপরী। ও নামেই ওকে ডাকে মন্তু। ও নামেই আদর করে ওকে।

সিকদার ব্যাটা বড় খিটমিটে লোক। সেদিন বললে, এত ফুসুর-ফাসুর ভালো লাগে না মিয়া। বিয়ে করতে চাও তো বল! মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে দিই।

হক কথা। এই তো চায় মন্তু।

চাইলেই হল। অলঙ্কারপত্তর নেই, কিছু নেই, মেয়ে কি মাগনা নাকি? ব্যাটা সিকদার এক মুখে চার কথা বলে। তিনপদ অলঙ্কার ফেলে দাও দিখিনি। এখনই নাতনীকে হাতে তুলে দিচ্ছি তোমার। শালা—চামার, চামার!

মন্তুকে বুঝেছে কী সে? তিনপদ অলঙ্কার বুঝি জোটাতে পারবে না মন্তু! এইতো আজকেই জুটিয়ে ফেলেছ সে একপদ। আর দু'পদে কয়দিন লাগবে! একহপ্তা কি পনের দিন। বড় জোর একমাস। তারপর—তারপর ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হল মন্তু।

বংশালের মাথায় এসে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াল সে।

মুকুলে একটা ছবি এসেছে। কালু বলেছে বড় মজেদার ছবি। শেষ শো'তে একটা চান্স নিলে মন্দ হয় না। আপন মনে কয়েকটা শিস্ দিল মন্তু।

শো শেষ হল রাত বারোটায়। কালো মেঘে ঢাকা গাঢ় অন্ধকার আকাশ বেয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখন। হল থেকে বেরিয়ে, সোজা রাস্তায় এসে নামল মন্তু। বগলে ওর সদ্য হাতসাফাইকরা একটা বাঘ মার্কা ছাতা।

ছাতাটা মেলে ধরে জনশূন্য নবাবপুর রোড বেয়ে এগিয়ে চলতে বেশ লাগছিল মন্তুর। গুনগুন্ করে সদ্য-দেখা সিনেমার দু-কলি গান ভাজতে লাগল সে।

হঠাৎ পেছনে কার পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল মন্তু। একটু ভালো করে তাকাতেই চিনল সে। সেই লোকটা—সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত দেহটা টেনে টেনে রোজ যে নবাবপুরের দিকে এগোয়। হ্যাংলা-রোগাটে দেহ। তেলবিহীন রুক্ষ চুল। লম্বা নাক। খাদে ঢোকা খুদে খুদে দুটি চোখ। মন্তুর মনে হল লোকটা যেন পিটপিট করে তাকাচ্ছে ওর দিকে। না ঠিক ওর দিকে নয়, ওর ছাতাটার দিকে।

ছাতার বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরল মন্তু।

বৃষ্টিটা আরও একটু জোরে আসতেই লোকটা পা চালিয়ে ছাতার নিচে এসে দাঁড়াল মন্তুর। উঁহু এ বৃষ্টিতে ভেজা মানে নির্ঘাত নিউমোনিয়া। একটা ম্লান হাসি ছড়িয়ে মন্তুর দিকে তাকাল সে।

গা-টা জ্বলে উঠল মন্তুর। ইচ্ছে হল এখনি ধাক্কিয়ে লোকটাকে রাস্তার একপাশে ফেলে দিতে। কিন্তু লোকটার হ্যাংলা দেহটার কথা ভেবে তা করল না মন্তু। শুধু বারকয়েক চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে দেখল তাকে।

আপনি কোনটায় গেছলেন? কথা না-বলাটা অভদ্রতার পরিচয়, তা ভালো করেই জানে মন্তু।

কোন্‌টায় মানে? আপনি কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।

লোকটার বোকা-বোকা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি পেল মন্তুর। এ-রাত বারোটার সময় মানুষ কোত্থেকে ফিরতে পারে,—লোকটা মন্তুকে এত অবুঝ মনে করল নাকি?

আসছেন কোত্থেকে? সোজা পথেই এবার জিজ্ঞেস করল সে!

দৈনিক 'দেশের কথা' অফিস থেকে।

সেখানে কাজ করেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনাকে সেক্রেটারিয়েটের ওখানে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ওখানেও কাজ করি আমি। এল. ডি. ক্লার্ক। সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা। ওখান থেকে আর বাড়ি যাইনে, সোজা চলে আসি পত্রিকা অফিসে। কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা বেজে যায়!

দিনে পনের ঘণ্টা কাজ করেন! বলেন কী সাহেব? তাহলে তো বেশ সুখেই আছেন। অনেক টাকা রোজগার হয়। এত টাকা করেন কী? মুরুব্বিয়ানা চালে কথাগুলো বলল মন্তু।

ম্লান হাসল লোকটা। পরিবারটা তো আর নেহায়েত ছোট নয়, ভাইবোন সবাই মিলে মোটা বারো জন। তা—দেড়শো টাকায় কিই বা হয়।

মাত্র দেড়শো টাকা! চোখ দুটো কপালে উঠল মন্তুর। একটা লোক দিনে পনের ঘণ্টা কাজ করে মাসের শেষে পায় মাত্র দেড়শো টাকা! বোকা, বোকা, লোকগুলো সব কী বোকা। হো-হো করে হাসতে ইচ্ছে হল মন্তুর।

আপনি কী করেন? এবার মন্তুর উত্তর দেবার পালা।

আমি? আমি বিজিনেস—মানে ব্যবসা করি। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জবাব দিল মন্তু।

কিসের?

এই ছোটখাটো—মানে সামান্য কারবার।

কথার ফাঁকে একটা জীর্ণ দালানের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। চুনকাম পড়েনি সে দালানে, কতদিন—কত বছর হবে তা কে জানে! নড়বড়ে দরজার কড়াটা বারকয়েক নাড়তেই একটা বিদ্‌ঘুটে শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। দরজার ওপাশে একটা নারী ছায়ামূর্তির অস্তিত্ব অনুভব করল মন্তু।

আরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আসুন। বৃষ্টিটা থামুক, তারপর যাবেন আসুন।

দ্বিরুক্তি না করে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল মন্তু!

তখন শুধু বৃষ্টি নয়। বৃষ্টির সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়তে শুরু করেছে। রাস্তায় পানি জমেছে অল্প অল্প।

কিন্তু ঘরে যা অন্ধকার, সামনে এগোনোই বিপজ্জনক। তাই দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইল মন্তু। লোকটা ভেতরে! একটা বাতি না হলে চলবে কী করে, ভদ্রলোক এসেছেন।

কিন্তু কী করব বল। ঘরে যে একফোঁটা তেলও নেই।

কারো কাছ থেকে অল্প একটু ধার আনা যাবে না?

ধার করে করেই তো এ তিনদিন চলেছে। মেয়েলি কণ্ঠের মিনমিনে আওয়াজ।

একটা অজানা পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে মন্তুর চোখের পর্দায়। স্থির পাথরের মতো তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

আরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে আসুন—আসুন। অন্ধকারের ভেতর ওর দিকে একটা হাতলভাঙা চেয়ার এগিয়ে দিল লোকটা। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন। নইলে পথের মধ্যে বৃষ্টিতে কী যে অবস্থা হত। হাতদুটো বারকয়েক কচলাল লোকটা।

মন্তু বসল।

বাতি এলে, ঘরের চারপাশে আলো তো চোখ বুলিয়ে নিল মন্তু।

ছোট্ট অপরিসর ঘর। মাঝখানে একটা চটের বেড়া দিয়ে দুভাগ করা হয়েছে ঘরটাকে। আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। একটা দড়ির খাটিয়া। একটা পুরনো টেবিল, একটা চেয়ার আর দেয়ালে একটা ছোট্ট আলনা।

বারকয়েক ভ্রূ কোঁচকালো মন্তু!

এ্যাঁ! মা, আমার টাকা! টাকা গেল কোথায় মা? বুক ফাটা চাপা আর্তনাদে চমকে উঠে ফিরে তাকাল মন্তু। লোকটা কি হার্টফেল করবে নাকি? নইলে অমন করছে কেন?

টাকা! টাকা! টাকা! কী সর্বনাশ হল গো আমাদের। কী সর্বনাশ হল! সরু মোটা অনেকগুলো কণ্ঠের চাপা গোঙানির শব্দ যেন চাবুক মেরে গেল মন্তুর বুকে, পিঠে, পেটে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

কী হয়েছে। আপনারা অমন করছেন কেন? ঠিক নিজেও বুঝতে পারল না মন্তু। কখন সে সবার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটা কঁকিয়ে যা বলল, তা শুনে রীতিমতো ঘামিয়ে উঠল সে। সেক্রেটারিয়েট থেকে পাওয়া একশ'টি টাকা বেমালুম উধাও হয়ে গেছে পকেট থেকে। বাসে করে যখন সংবাদপত্রের অফিসে গিয়েছিলেন, তখন বোধ হয় কেউ পকেট থেকে তুলে নিয়েছে বলে তার ধারণা।

ওইতো, আপনার বুকপকেটেই তো রয়েছে টাকাগুলো। আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ল মন্তু, যেন এভারেস্টের চূড়োয় উঠেছে।

না না, ওগুলো 'দেশের কথা' থেকে পেয়েছি। ওখানে পঞ্চাশ টাকা। সরবে প্রতিবাদ জানাল লোকটা। তারপর নির্বিকারভাবে মুখের লাগাম খুলে দিল সে পকেটমারের চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডি চটকাবার উদ্দেশ্যে।

মন্তু তখনো নির্বাক।

বাইরে তখন ঝড় বইছে। বাজ পড়ছে প্রচণ্ড শব্দে।

রাস্তায় হাঁটুর উপর পানি।

বৃষ্টি থামল না। বরং আরো বেড়ে গেল।

আর, তাই মন্তুর যাওয়া হল না।

টাকার শোকে একেবারে মুষড়ে পড়লেও, অতিথি সৎকার করতে ভুলল না লোকটা। ছেঁড়া কাঁথার ওপর বৌ-এর একখানা পুরনো শাড়ি বিছিয়ে দিয়ে মন্তুর শোবার বন্দোবস্ত করে দিল।

হাঁ না কিছুই করল না মন্তু। সোজা শুয়ে পড়ল সে।

শুল কিন্তু ঘুমাল না। জেগেই রইল মন্তু। আর অপেক্ষা করতে লাগল সবাই কতক্ষণে ঘুমায়।

দেয়ালের সাথে ঝুলানো শার্টের বুকপকেটে পঞ্চাশটা টাকা। পাঁচখানা দশ টাকার কড়কড়ে নোট! কিছুতেই ভুলতে পারছিল না সে।

দূরে কাদের দেয়ালঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হল।

নিরালা পৃথিবী, নিঃশব্দ তন্দ্রার নিমগ্ন।

অতি সাবধানে উঠে দাঁড়াল সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সামনে।

আর একটু এগুতেই, কান্না-মেশানো স্বরে কে যেন বলল, মাগো, হাঁড়িতে কি একটা ভাতও নেই। পেটটা যে পুড়ে গেল।

অজানা পৃথিবীর আর এক পাঠ।

রীতিমতো শিউরে উঠল মন্তু।

বাচ্চা মেয়েটা এখনও ঘুমোয়নি। পেটে ক্ষুধা নিয়ে কেমন করেই বা ঘুমোবে সে।

মায়ের সান্ত্বনাবাক্য শোনা গেল একটু পরে। কী আর করবে মা।

রাতটা যে কোনোমতে কাটাতেই হবে।

একটা কচি মেয়ে কিছু না-খেয়েই রাত কাটাবে? পকেটে হাত দিয়েও টাকাগুলো নিতে পারল না মন্তু। মোট দেড়শ'টি টাকা। এ দিয়েই এদের কোনোমতে মাস কাটাতে হয়। এবার মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে কেমন করে চলবে এরা? মরে যাবে, নির্ঘাত মরে যাবে! মরে যাবে ওই কচি মেয়েটা! ওই হাড় বের করা বউটা! আর ওই বাকি ক'জনা আছে সবাই। সবাই ওরা মরে যাবে। উহ্! ভাবতে গিয়ে মন্তুর কাঠিন্যে-ভরা প্রাণটাও যেন কেমন করে উঠল আজ। নিজের অভাব-ভরা অতীত মনে পড়ল।

দূরে কার দেয়ালঘড়িতে আরো দুটো শব্দ হল।

আর দেরি করল না মন্তু। নিঃশব্দে পকেটের ভেতর হাতটা ঢুকিয়ে দিল সে। সোনার আংটিটা এ আঁধারের ভেতরও কেমন চিক্‌চিক্ করছে। দু-হাতে আংটিটা অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করল সে। পরীবানুর মুখটা ভেসে উঠল চোখের পর্দায়।

মন্তু চোখ বুজল।

চোখ খুলল।

তারপর আস্তে আংটিটা ছেড়ে দিল, দেয়ালে ঝোলানো শার্টের বুকপকেটে। খস্ করে একটা শব্দ হল সেখানে। তাও কান পেতে শুনল। তারপর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

বৃষ্টিটা তখন থেমে গেছে। আর রাহুমুক্ত চাঁদ খলখলিয়ে হাসছে আকাশে।

পোস্টার

দূর থেকেই দেখলেন আমজাদ সাহেব। লাল কালো হরফে লেখা অক্ষরগুলো সকালের সোনালি রোদে কেমন চিক্‌চিক্ করছে। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

বাজারে এক মেছুনীর সাথে ঝগড়া করে মেজাজটা এমনিতেই বিগড়ে ছিল আমজাদ সাহেবের। তার ওপর সদ্য-চুনকাম-করা বাড়ির দেয়ালে এহেন পোস্টার দেখে রাগে থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেকে ডাকলেন। আনু-উ-উ।

আনুর দেখা নেই। বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে লাটিম আর মার্বেল হাতে বেরিয়ে পড়েছে সে সেই ভোরে। কানু এসে বলল, কি বাবা?

তোকে কে ডেকেছে। আনু কোথায়? চোখ রাঙিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন আমজাদ সাহেব। এত কষ্ট করে, বাড়িওয়ালার হাত-পা ধরে হোয়াইটওয়াশ করালাম। দেয়ালে লিখে দিলাম বিজ্ঞাপন লাগিও না। তবুও—তবুও দেখ না পাজিগুলোর যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকত। যতসব নচ্ছার কোথাকার।

আমায় গাল দিচ্ছ কেন। ওগুলো কি আমি লাগিয়েছি নাকি? মুখ ভার করল কানু।

ছেলের কথায় আরো ক্রুদ্ধ হলেন আমজাদ সাহেব। শুয়ার কোথাকার। তোর কথা কে বলছে? বলছিলাম, যে বাঁদরগুলো এসব পোস্টার লাগায় তাদের ধরতে পারিস না? ধরে জুতোপেটা করে দিতে পারিস না তাদের। থাকিস কোথায়? রীতিমতো হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন আমজাদ সাহেব।

পাশের বাড়ির আফজাল সাহেব বাইরে চিৎকার শুনেই বোধ হয় বেরিয়েছিলেন। বললেন, কী ব্যাপার আমজাদ সাহেব। এই সকালবেলা—।

আর বলবেন না সাহেব, সাধে কী আর চেঁচাচ্ছি। এসেই দেখুন-না একবার। বলে আঙুল দিয়ে দেয়ালের পোস্টারটাকে দেখালেন আমজাদ সাহেব।

ও। এ আর কী। ও তো সব জায়গায় লাগিয়েছে ওরা। শহরটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে সাহেব। তারিফ করতে হয় এই ছেলেগুলোর।

আঁ! আপনি বলছেন কী? রীতিমতো অবাক হলেন আমজাদ সাহেব। আপনি ওই ছেলেগুলোর তারিফ করছেন?

তারিফ করব না? আফজাল সাহেব বললেন। দেশের মধ্যে সাচ্চা কেউ যদি থেকে থাকে তো ওরাই আছে। ওরাই লড়ছে দেশের স্বার্থের জন্য।

আর মন্ত্রীরা বুঝি কিছু করছে না আপনি বলতে চান?

করছে না কে বলছে। আলবত করছে। আফজাল সাহেব উত্তর করলেন। খবরের কাগজে দেখেন না। আজ এখানে টিপার্টি, কাল ওখানে ডিনারের আয়োজন। পরশু নিউইয়র্ক যাত্রা। করছে না কে বলছে। অনেক করছে ওরা।

তা তো আপনারা বলবেনই। একচোখা লোক কিনা, তাই একদিকটাই দেখেন শুধু। বলে আর সেখানে দাঁড়ালেন না আমজাদ সাহেব। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

হালিমা বিবি তৈরি হয়েই ছিলেন বোধ হয়। ভেতরে ঢুকতেই মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হল্লা করবার আর সময় পেলে না? এদিকে অফিসের সময় হয়ে এল, একটু পরেই তো ভাত ভাত করে বাড়ি ফাটাবে।

স্ত্রীর সাথে এ-সময়ে ঝগড়া করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না আমজাদ সাহেবের। তবুও কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন, ঘরে বসে বসে হুকুম সবাই দিতে পারে। কাজের বেলায় কেউ নয়।

থলে থেকে তরকারি বের করতে গিয়ে হঠাৎ বাধা পেলেন হালিমা বিবি। কী বললে, কাজ করি না আমি, না? বলি এই ভোর-সকালে উঠে বিছানাপত্তর গুটানো থেকে শুরু করে, ঘর ঝাড়ু দেয়া, বাসনপত্তর মাজা, চুলোয় আঁচ দেয়া এগুলো কি তুমি করেছ না আমি। কে করেছে শুনি?

খুব একটা খারাপ কথা মুখে এসেছিল আমজাদ সাহেবের। সামলে নিলেন অতিকষ্টে। বয়স্ক ছেলেমেয়েদের সামনে রোজ রোজ এ-ধরনের ঝগড়াঝাটি সত্যি কী বিশ্রী ব্যাপার। স্ত্রীর দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করে গামছা আর লুঙি হাতে কলগোড়ায় চলে গেলেন তিনি।

স্ত্রীর আক্ষেপ-ভরা খেদোক্তি সেখানেও ধাওয়া করল তাকে। কাজ করেও কোনো নাম নেই। কোনো স্বীকৃতি নেই! বারো বছর বয়সে মাথায় ঘোমটা চড়িয়ে মিনসের ঘর করতে এসেছি। সেই থেকে কাজ আর কাজ। খেটে খেটে শরীর আমার হাড্ডিসার হয়েছে। তবুও নাম নেই, তবুও—। বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করলেন হালিমা বিবি। খোদা আমার মরণ হয় না কেন। আজরাইলের কি চোখ কানা হয়েছে, আমায় দেখে না?

চটপট গোছলটা সেরে একটুপরেই ফিরে এলেন আমজাদ সাহেব। তখনও নিজের অদৃষ্টকে একটানা ধিক্কার দিচ্ছেন হালিমা বিবি। একটা চাকর রাখেনি লোকটা। আমায় বাঁদীর মতো খাটিয়ে নিয়েছে। একটা ভালো কাপড় কিনে দেয়নি কোনোদিন। ছেঁড়া নেংটি পরে পরে আমি থাকি! তবুও নাম নেই। তবুও—।

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লেন আমজাদ সাহেব। চুপ করো বলছি। নইলে এখনি গলা টিপে দেব।

দাও না, দাও। সামনে এগিয়ে এলেন হালিমা বিবি।

সরোষদৃষ্টিতে তার দিকে একপলক তাকালেন আমজাদ সাহেব। তারপর, আলনা থেকে জামাটা নামিয়ে নিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে এলেন তিনি। রাস্তায় নেমে কেন যেন আবার পেছনে দেয়ালটার দিকে ফিরে তাকালেন আমজাদ সাহেব।

আর একখানা পোস্টার।

ঠিক আগের পোস্টারটার পাশেই সেঁটে দেওয়া হয়েছে। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। বাঁচার মতো মজুরি চাই।

এ মুহূর্তে কে যেন একটিন জ্বলন্ত পেট্রোল ঢেলে দিয়েছে আমজাদ সাহেবের গায়ের ওপর। দপ করে জ্বলে উঠলেন আমজাদ সাহেব। আন -উ-উ।

আনু তখনও ফেরেনি! কানু এসে ভয়ে ভয়ে বলল, কি বাবা?

কি-বাবা-আ-আ। তীব্র দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করলেন তিনি। তুই কেন আনু কোথায়।

কানু বানিয়ে বলল, ও স্কুলে গেছে।

ও স্কুলে গেছে, আর তুমি ঘরে বসে বসে করছ কী। আঁ? ছেলেকে ধমকে উঠলেন আমজাদ সাহেব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার দেখছিস কী, যা-না একটা বাঁশ জোগাড় করে এনে নিচু থেকে গুঁতিয়ে পোস্টার দুটো ফেলে দে মাটিতে। আর শোন্, সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি তুই, খবরদার কেউ যেন পোস্টার-তোস্টার না লাগাতে পারে হাঁ। বুঝলি তো।

জি হাঁ।

হাঁ। যা বললুম মনে থাকে যেন। বলে অফিসমুখো হলেন আমজাদ সাহেব।

পেছন থেকে মেজো মেয়ে টুনি ডেকে বলল, বাবা ভাত খেয়ে যাও! মা ভাত খেয়ে যেতে বলছে।

মেয়ের ডাকে পেছনে একবার ফিরে তাকালেও, থামলেন না আমজাদ সাহেব। আগের মতোই চলতে থাকলেন।

না-খেয়েই আজ অফিসে যাবেন তিনি।

শুধু আজ বলে নয়। বছরে বারো মাসে তিন মাস না-খেয়েই অফিস করেন আমজাদ সাহেব। কোনো-কোনোদিন পেটের অবস্থা বেশি কাহিল হয়ে পড়লে, মোড়ে বিহারীদের সস্তা হোটেলটায় ঢুকে গোটা-দুয়েক ডালপুরী আর কয়েক গ্লাস পানি খেয়ে অফিসে যান তিনি। মাসের প্রথম হলে, অফিসের পাশে দিল্লি রেস্টুরেন্টটায় ঢুকে শিককাবাব আর চাপাতি উদরস্থ করেন।

আজ কিন্তু এ-মুখো ও-মুখো কোনো মুখোই হলেন না আমজাদ সাহেব। অনেকটা দৌড়াতে দৌড়াতে অফিসমুখে ছুটলেন তিনি। নতুন সাহেব ভীষণ কড়া। পাঁচমিনিট লেট হলে তাহা পাঁচ টাকা জরিমানা করে বসে থাকে।

শা'র সাহেবের গুষ্ঠীর শ্রাদ্ধ হত।

কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেলেন আমজাদ সাহেব। সরু বারান্দাটা পার হতেই সাহেবের সাথে একেবারে মুখোমুখি।

এই যে আমজাদ সাহেব। আজও আপনি লেট। পনের মিনিট। পনের মিনিট নয় স্যার। পাঁচমিনিট। কথাটা ঠোঁটের কাছে এসেও কেন যেন থেকে গেল। মুখ কাঁচুমাচু

করে বারকয়েক হাত কচলালেন তিনি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নতুন জুতোর মচমচ শব্দ তুলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন সাহেব তাঁর চেম্বারের দিকে।

ভেতরে ঢুকে সবার দিকে একপলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের আদি অকৃত্রিম চেয়ারটিতে এসে বসলেন আমজাদ সাহেব।

এল. ডি. ক্লার্ক হাসমত মিয়া, বারকয়েক তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি আমজাদ সাহেব, চোখ দুটো এত লাল কেন? ভাবীর সাথে ঝগড়া করে এসেছেন বুঝি?

কথা শুনে দাঁতে জিভ কাটলেন আমজাদ সাহেব। কী-যে বলেন, খানদানি পরিবারে বৌয়ের সাথে ঝগড়া? ছ্যা—ছ্যা। জানেন, আমার নানা ছিলেন খাঁটি শেখ। আর দাদা—।

আরে না না, তা কি আর জানিনে। জানি। তবে এমনি একটু ঠাট্টা করছিলুম আপনার সাথে। বললেন হাসমত মিয়া।

মনে মনে বড় গর্ববোধ করলেন আমজাদ সাহেব। বললেন, ঠাট্টা করে যে বলছেন তা আমি বুঝেছি। তবে কিনা, চোখ দুটো লাল হবার পেছনেও কারণ আছে একটা।

কারণটা বলতে গিয়ে, দেয়ালে পোস্টার লাগানো আর তা দেখে তাঁর ভীষণ চটে যাওয়ার ইতিবৃত্তটাই শোনালেন আমজাদ সাহেব।

হাসমত মিয়া বললেন, এতে রাগ করবার কী আছে?

আলবত আছে। আমজাদ সাহেব মাথা ঝাঁকালেন। কতকগুলো বখাটে ছোকড়া, বুঝলেন হাসমত সাহেব। কাজকর্ম কিছুই নেই। সারাদিন শুধু এই করেই বেড়ায়। আসলে কী জানেন—এরা হচ্ছে দেশের শত্রু। মানে এরা বিদেশের দালাল। কেন আপনি পরশু প্রধানমন্ত্রীর বেতার-বক্তৃতা শোনেন নি?

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন আমজাদ সাহেব।

হাসমত মিয়া বললেন, চুপ, সাহেব আসছে।

সাহেব ঠিক এলেন না। দরজা দিয়ে একবার উঁকি মেরে আবার চলে গেলেন বাইরে।

কেন যেন আজ অফিসের কাজে মোটেই মন বসছিল না আমজাদ সাহেবের। এটা-ওটা অনেক কিছু ভাবছিলেন তিনি।

কালু মুদির পাওনা, দুধওয়ালার বাকি, মেয়ের বিয়ে—অনেক চিন্তাই মাথার ভেতর গিজগিজ করছিলে তাঁর।

পাশের সিটে বসা হাসমত মিয়া খস্‌খস্‌ শব্দে কলম চালাচ্ছিলেন আপন মনে।

সামনের সারিতে বসা রমেশবাবু তার নস্যির ডিবে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন পকেটময়, আর বিরক্তিতে ভ্রু বাঁকাচ্ছিলেন বারবার।

সদ্য-বিয়ে-করা ডেসপাচার মুলকুত মিয়া কাজের ফাঁকে ফিসফিসিয়ে নতুন বৌ-এর গল্প করছিলেন পাশের সিটে বসা আকবর আলির সাথে।

সবার দিকে একপলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফাইলের ভেতর ডুব দিলেন আমজাদ সাহেব।

মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখাটা একটানা ঘুরছিল বনবন শব্দে।

দেয়ালঘড়িতে তখন বোধ হয় বেলা একটা।

হঠাৎ ওপাশের টেবিল থেকে ক্যাশিয়ার হুরমত আলি চাপাস্বরে বললেন, শুনছেন আমজাদ সাহেব?

কী।

অফিসে নাকি ছাঁটাই হবে।

ছাঁটাই? তড়িত-আহত হওয়ার মতো আচমকা চমকে উঠলেন আমজাদ সাহেব।

হাঁ, ছাঁটাই। আস্তে বললেন হুরমত আলি।

খবরটা একমুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল অফিসের আনাচে-কানাচে। চলন্ত কলমগুলো শ্লথ হল; থেমে পড়ল; খসে পড়ল অনেকের হাত থেকে। ফ্যাকাশে দৃষ্টি তুলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল সবাই।

ছাঁটাই? সেকি? কাঁপা ঠোঁটে বিড়বিড় করে উঠলেন হাসমত মিয়া।

ও গড সেইভ মি। সেইভ মি গড। চাপা আর্তনাদ করে উঠল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টাইপিস্টটা।

আমজাদ সাহেব নিষ্কম্প। নিশ্চুপ। একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল না তাঁর। মাথার ভেতর শুধু গিজগিজ করছিল কালু মুদির পাওনা, দুধওয়ালার বাকি, মেয়ের বিয়ে—। কপালের শিরাগুলো টনটন করছিল তাঁর।

সব অফিসেই ছাঁটাই হচ্ছে সাহেব। নিচ্ছে না, শুধু বের করছে। ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন হুরমত আলি।

কপালটা দুহাতে চেপে ধরে এল. ডি. ক্লার্ক রমেশবাবু বললেন, কাল সেক্রেটারিয়েট থেকেও নাকি সাতজনকে ছাঁটাই করেছে শুনলাম।

ও গড সেইভ মি। সেইভ মি গড। আর একবার আর্তনাদ করে উঠল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টাইপিস্টটা।

ড্রাফটসম্যান আকবর আলি এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। হঠাৎ টেবিলের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুসি মেরে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। ছাঁটাই করবে মানে—ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি?

হাঁ ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি? এটা মগের মুল্লুক নয়। তাঁকে সমর্থন করে বললেন মুলকুত মিয়া। আমাদের বৌ-পরিবার নেই? ভাই-বোন নেই? তারা চলবে কেমন করে? ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি যে ছাঁটাই করে দেবে?

আহ্ মুলকুত সাহেব! আস্তে আস্তে; এত চিৎকার করছেন কেন? চাপাস্বরে তাকে তিরস্কার করলেন বুড়ো ক্যাশিয়ার হুরমত আলি। আমজাদ সাহেব তখনও নিশ্চুপ নিষ্কম্প।

বিকেলে, অফিস ছুটির মিনিট কয়েক আগেই টাইপ-করা নামগুলো টাঙানো দেখা গেল বারান্দায় নোটিশবোর্ডের ওপর।

অনেকগুলো নাম।

একটা। দুটো। তিনটে। তিনটে নামের নিচের নামটার দিকে চোখ পড়তেই মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে বারান্দায় বসে পড়লেন আমজাদ সাহেব। খোদা, খোদা এ কী করলে!

গড। ও গড। গড।

ভগবান! ছেলেপিলেগুলো যে না-খেয়ে মরবে ভগবান।

অনেকটা টলতে টলতেই অফিস ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলেন আমজাদ সাহেব।

একটা নিরালা পার্কে ঢুকে একখানা আধভাঙা বেঞ্চের ওপর ঝুপ করে বসে পড়লেন তিনি। নিরালা একটু চিন্তা করবেন। কিন্তু চিন্তা করতে বসে বহুমুখী চিন্তার ধাক্কায় অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠলেন আমজাদ সাহেব।

দূরে একটা হলুদে বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে পাশের বাড়ির একটা ছেলের সাথে ইশারায় কথা বলছে। সেদিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। চিঠির আদান-প্রদান হল এ জানালা থেকে ও জানালায়। দৃষ্টি সেদিকে থাকলেও, ভাবছেন তিনি অন্য কিছু। চাকরিটা তাহলে সত্যিসত্যিই গেল।

আরে আমজাদ যে। কী ব্যাপার, এখানে কী করছ? পেছনে পরিচিত কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালেন আমজাদ সাহেব।

আবিদ সাহেব দাঁড়িয়ে। এককালের সহপাঠী; বর্তমানে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কাজ করেন।

ম্লান হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন আমজাদ সাহেব। কি হে, কেমন আছ ভালো তো?

ভালো আর কোথায়। ঘরে বৌয়ের অসুখ।

অসুখ?

হাঁ সেই পুরনো রোগটাই আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে।

ডাক্তার দেখাওনি?

ডাক্তার তো বলেছে রক্ত বলতে কিছু নেই শরীরে। বলে একটু থামলেন আবিদ সাহেব। তা ভাই একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করে দিতে পারো? বড় কষ্টে আছি।

কেন তুমি চাকরি করতে না। সেটা কী হল? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমজাদ সাহেব।

সে তো গত পরশুই খতম। বলে ম্লান হাসলেন আবিদ সাহেব।

সাতজনকে ছাঁটাই করেছে আমাদের ওখান থেকে। শুনোনি ?

ছাঁটাই! ছাঁটাই! ছাঁটাই!

উহ্! কী হবে এই পোড়া পৃথিবীটার?

কপালের ফুলে-ওঠা শিরা দুটো টিপে ধরে উঠে দাঁড়ালেন আমজাদ সাহেব।

বাসার কাছে এসে পৌছতে চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল তাঁর। হাত-পা সমেত গোটা শরীরটা আর-একবার কেঁপে উঠল, রাগে—ক্ষোভে। সদা-চুনকাম-করা তার একতালা দালানটার দিকে আগুনঝরা দৃষ্টিতে আর-একবার তাকালেন আমজাদ সাহেব। ময়লা পায়জামা আর ছেঁড়া শার্ট-পরা একটা কুড়ি-বাইশ বছরের রোগা ছেলে দেয়ালে পোস্টার লাগাচ্ছে। ধড়ে প্রাণ রাখব না শালার। চাপা রোষে গর্জে উঠলেন তিনি। শালার গুষ্টীর শ্রাদ্ধ করব আজ। হাত দুটো নিশপিশ করছিল আমজাদ সাহেবের। এতদিন পর হাতের মুঠোয় পেয়েছেন ছেলেটাকে, যতসব বখাটে ছোকড়া—শা'র আজ আর আস্ত রাখব না, পিষে ফেলব পায়ের তলায়।

পোস্টারটা দেয়ালে সেঁটে দিয়ে ছেলেটা ধীরে ধীরে ততক্ষণে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। হিংস্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন আমজাদ সাহেব। হঠাৎ পোস্টারটার দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। পুরনো খবরের কাগজের ওপর লাল কালিতে লেখা গোটা গোটা অক্ষর। ছাঁটাই করা চলবে না।

ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি

মাঝে মাঝে ভাবি কতকগুলো কুষ্ঠরোগীকে নিয়ে একটা ছবি বানাব। তাদের সারা দেহে পচন ধরেছে, তবু তারা চিৎকার করে বলছে—না না। আমাদের কিছু হয়নি তো!

তাদের হাত-পাগুলো সব গলে গলে খসে খসে পড়ছে। তবু তারা উগ্রকণ্ঠে বলছে। ও কিছু না, ও কিছু না। আমাদের কিছু হয়নি তো। ওদের পুঁজভরা দেহ থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তবু তারা আতর আর গোলাপজলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে চিৎকার করছে। কিছু হয়নি তো!

তারা মরে ভূত হয়ে গেছে। তবু তাদের প্রেতাত্মা দুর্বার আক্রোশে আর্তনাদ করে বলছে—আমরা মরিনি তো।

ইচ্ছে করে আমার পাশের বাড়ির ছোটবউটিকে নিয়ে একটা ছবি বানাই। ছোট বউটি, যার স্বামী আজ দশবছর ধরে জেলখানায় পচে মরছে।

কী অপরাধ তার, কেউ জানে না।

কী দোষে তাকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে তা তার পাষাণ বউটিকে জিজ্ঞেস করলেও সে মুখ ফুটে কিছু বলে না।

অথচ বউটি কী গভীর যন্ত্রণায় ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পায়।

দিনে, রাতে, নীরবে।

তবু চিৎকার করে সে কাঁদছে না।

তবু মুখ ফুটে সে কিছু বলবে না।

ইচ্ছে করে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে ছবি তৈরি করতে।

সেই বন্ধু।

বহুদিন আগে যাকে প্রথমে আরমানিটোলায় পরে পল্টনে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিতে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম সহস্র জনতার মিছিলের মাঝখানে। সেই একুশের ভোরে যে আমার কানে কানে বলেছিল। বন্ধু, যদি আজ মরে যাই তাহলে আমার মাকে কাঁদতে নিষেধ করে দিও। তাকে বোলো সময়ের ডাকে আমি মরলাম।

সময় পাল্টে গেছে হয়তো। তাই আজ সেই বন্ধু আমার, আমলাদের ঘরে ঘরে যুবতী মেয়েদের ভেট পাঠায় দুটো পারমিটের লোভে। আহা, তাকে নিয়ে যদি একটা ছবি বানাতে পারতাম!

আমার ছোট বোনটি!

সে একটা ছায়াছবির বিষয়বস্তু হতে পারত।

তার বড় আশা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। দু-দুবার কঠিন রোগে ভোগার পর ডাক্তার তার লেখাপড়া বন্ধ করে দিল।

বলল, ব্রেন এফেক্ট করতে পারে।

কিন্তু সে শুনল না। রাত জেগে জেগে পড়ল সে।

পাস করল! ভালোই পাস করল সে—প্রথম বিভাগে।

তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে আনাগোনা শুরু হল তার।

রোজ যায়। রোজ আসে।

একদিন দেখলাম সিঁড়ির গোড়ায় বসে বসে কাঁদছে।

বললাম। কিরে, কী হয়েছে তোর?

বলল। আমায় ভর্তি করল না ওরা।

কেন?

আমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে অনেকক্ষণ দেরি করল সে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, কলেজে পড়ার সময় স্ট্রাইক করেছিলাম তাই।

এর কিছুদিন পরে ব্রেনটা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেল তার।

বোনটি আমার পাগল হয়ে গেল।

আহা, বড় শখ ছিল তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়বে।

মাঝে মাঝে ভাবি, কতকগুলো অসংস্কৃত লোককে নিয়ে একটা ছবি বানাব।

যারা দিনরাত শুধু সংস্কৃতির কথা বলে।

কালচারের কথা বলে।

ভাষার কথা বলে।

ঐতিহ্যের কথা বলে।

বলে আর বলে।

কারণে বলে।

অকারণে বলে।

বলে বলে একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাল-তমালের স্নিগ্ধ ছায়ায়।

তারপর স্বপ্ন দেখে!

ধূসর মরুভূমির স্বপ্ন।

কতকগুলো উটের স্বপ্ন।

তৈমুর লং আর চেঙ্গিস খাঁর স্বপ্ন।

হিটলার আর মুসোলিনীর স্বপ্ন।

আহা, কী সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখে ওরা।

ইচ্ছে করে সেলুলয়েডে কয়েকটি মানুষের ছবি আঁকি। যাদের মুখগুলো শূকর-শূকরীর মতো।

যাদের জিহ্বা সাপের ফণার মতো।

যাদের চোখজোড়া ইঁদুর ছানার মতো।

যাদের হাতগুলো বাঘের থাবার মতো।

আর যাদের মন মানুষের মনের মতো সহস্র জটিলতার গিঁটে বাঁধা। যারা শুধু পরস্পরের সঙ্গে কলহ করে আর অহরহ মিথ্যে কথা বলে।

যারা শুধু দিনরাত ভাতের কথা বলে।

অভাবের কথা বলে।

মাংসের ঝোলের কথা বলে।

আর মরে। গিরগিটির মতো। সাপ-ব্যাঙ কেঁচোর মতো।

মরেও মরে না।

গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা বিইয়ে বংশ বৃদ্ধি করে রেখে যায়।

আহা, আমি যদি সেই তরুণকে নিয়ে একটা ছবি বানাতে পারতাম! যার জীবন সহস্র দেয়ালের চাপে রুদ্ধশ্বাস।

আইনের দেয়াল।

সমাজের দেয়াল।

ধর্মের দেয়াল।

রাজনীতির দেয়াল।

দারিদ্র্যের দেয়াল।

সারাদিন সে ওই দেয়ালগুলোতে মাথা ঠুকছে আর বলছে আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে মুক্তি দাও। আমার ইচ্ছেগুলোকে পায়রার পাখনায় উড়ে যেতে দাও আকাশে। কিম্বা সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দাও। সেখানে তারা প্রাণভরে সাঁতার কাটুক।

সারাদিন সে শুধু ছুটছে, ভাবছে—আবার ছুটছে।

এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে।

ঈর্ষার দেয়াল।

ঘৃণার দেয়াল।

মিথ্যার দেয়াল।

সংকীর্ণতার দেয়াল।

কত দেয়াল ভাঙবে সে?

তবু সে আশাহত হয়। ইচ্ছার আগুন বুকে জ্বেলে রেখে তবু সে ছুটছে আর ভাঙছে।

সহস্র দেয়ালের নিচে মাথা কুটে কুটে বলছে, মুক্তি দাও।

আমাকে মুক্তি দাও।

যদিও সে জানে মানুষের আয়ু অত্যন্ত সীমিত।

কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ

কুকুরগুলো একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিল।

সাদা কুকুর।

কালো কুকুর।

মেয়ে কুকুর।

পুরুষ কুকুর।

তাদের চিৎকারে শহরে যেখানে যত ভদ্রলোক ছিল সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তারা ভীষণ বিরক্ত হল।

রাগ করল।

এবং কুকুরগুলোকে গুলি করে মারার জন্যে বন্দুক হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

বাইরে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোকরা দেখল।

পথ ঘাট মাঠ সব কুকুরে কুকুরারণ্য।

দাওয়ায় কুকুর।

কার্নিশে কুকর।

হোটেলে কুকুর।

রেস্তোরাঁয় কুকুর।

স্কুল। পাঠশালা। অফিস। আদালত। সর্বত্র কুকুরে কুকুরময়।

সবাই গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।

সমস্ত কণ্ঠ এক হয়ে বিকট শব্দ হচ্ছে চারদিকে।

সহসা ভদ্রলোকরা গুলি করতে লাগল।

গুলির শব্দে শহরে যত বেশ্যা ছিল, সবাই ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

ছোট বেশ্যা।

বড় বেশ্যা।

যুবতী বেশ্যা।

বুড়ি বেশ্যা।

কুৎসিত বেশ্যা।

সুন্দরী বেশ্যা।

ওরা মৃত কুকুরগুলোর জন্যে করুণ কান্না জুড়ে দিল।

বেশ্যাদের কান্নায় সমস্ত শহরে বিষাদের ছায়া নেমে এল।

আর।

ওদের কান্না দেখে ভদ্রলোকেরা হাতে-ধরে-রাখা বন্দুকগুলো ঘৃণার সঙ্গে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল।

এবং।

কুকুরের মতো চিৎকার জুড়ে দিল।

কয়েকটি সংলাপ

[আজ থেকে উনিশ বছর আগে যে-সংলাপ পথে-প্রান্তরে শুনেছিলাম]

ভাইসব! আমরা কী চেয়েছিলাম। কী পেয়েছি।

আমরা চেয়েছিলাম একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। যেখানে সুখ থাকবে। শান্তি থাকবে।

কিন্তু আমরা কী পেয়েছি।

কিছু না।

কিছু না।

কিছু না।

ওরা আমাদের সুখ কেড়ে নিয়েছে।

আমাদের ভাইদের ধরে ধরে জেলখানায় পুরেছে।

জেলখানার ভেতর গুলি করে দেশপ্রেমিকদের হত্যা করছে ওরা।

আমার মাকে কাঁদিয়েছে।

আমার বাবাকে বরখাস্ত করেছে।

আমার ভাইবোনদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে।

এখন ওরা আমাদের ভাষাও কেড়ে নিতে চায়।

না।

না।

না।

আমরা তা হতে দেব না।

আমাদের মুখের ভাষাকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না।

হরতাল।

সারা দেশব্যাপী আমরা হরতাল করব।

না না, সেটা ঠিক হবে না। তার চেয়ে এসো আমরা সারা দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ করি।

কী হবে হরতাল করে।

ওরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে।

হরতাল হবে না।

মিছিল বের করতে পারবে না।

না।

না।

বেআইনি আইনকে আমরা মানি না।

আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙব!

ভাঙব।

ভাঙব।

ওরা গুলি করেছে।

শুনেছ ওরা গুলি করেছে।

ওরা গুলি করে কয়েকটি ছাত্র মেরে ফেলেছে।

কোথায়?

মেডিক্যাল কলেজের মোড়ে।

আশ্চর্য।

এজন্যে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম।

এজন্যে আমরা পাকিস্তান এনেছিলাম।

এই সরকারকে আমরা মানি না।

খুনে ডাকাতদের আমরা মানি না।

পদত্যাগ চাই।

ওদের পদত্যাগ চাই।

বরকতের খুন আমরা ভুলব না।

রফিক আর জব্বারের খুন আমরা ভুলব না।

বিচার চাই।

ফাঁসি চাই ওই খুনীদের।

ভাইসব। সামনে এগিয়ে চলুন।

ওদের গোলাগুলি আর বেয়নেটকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলুন।

[আজকের সংলাপ। পথে-প্রান্তরে যে-সংলাপ শুনছি]

কী চাই?

একুশে ফেব্রুয়ারির চাঁদা।

কী করবেন?

একটা ম্যাগাজিন বের করব।

ম্যাগাজিন বের করে কী হবে?

বাঙলা একাডেমী থেকে ওরা পুরস্কার দেবে বলেছে। ওখানে জমা দেব।

নাহ্। তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। ওরা নামজাদা সব গায়ক-গায়িকাদের বুক করে বসে আছে। আর তোমরা সব আলসের হদ্দ চুপ করে ঘরে বসে গরুর গোস্ত খাচ্ছ?

চিন্তা করবেন না স্যার। আয়োজন আমরাও কম করিনি। ওদের চেয়ে আমাদের ফাংশন, আপনি দেখবেন অনেক ভালো হবে।

ভালো হবে কী। ভালো হতেই হবে। এর সঙ্গে আমার মান-সম্মান জড়িয়ে রয়েছে। বুঝলে না, আমি হলাম তোমাদের প্রেসিডেন্ট। আর হ্যাঁ। আমার বক্তৃতাটা ভালো করে লিখে দিও কিন্তু। একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাসটা যেন থাকে ওর মধ্যে। আর শহীদদের নামগুলো। দেখো, গতবারের মতো আবার উল্টোপাল্টা লিখে রেখো না। না, না, তুমি চিন্তা করো না। আমি দিনকয়েকের মধ্যে বাড়ি আসছি। তারপর ওদের মাথা ভাঙব।

কিন্তু তুমি আসবে কী করে?

কেন?

তুমি না বললে, ছুটিছাটা নেই।

আছে, আছে, ওইতো দিনকয়েক পরে একুশে ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন। তুমি একটুও বোঝ না। আমি আগের দিন রাতেই এখান থেকে রওনা হয়ে যাব। তারপর দ্যাখো না শালাদের মাথা যদি-না ভেঙেছি। কী সাহস ওদের, আমার ক্ষেতের কুমড়ো চুরি করে নিয়ে যায়!

ওরা কোথায় মিটিং করবে?

পল্টনে।

আর তারা?

তারা করবে বায়তুল মোকাররমে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট খালি নেই?

নেই।

বাঙলা একাডেমী?

ওখানেও কারা যেন সেমিনার করছে।

তাহলে?

কী যে করব বুঝতে পাচ্ছি না।

শোনো। এক কাজ করো। আমাদের মিটিংটা আমরা রেসকোর্সেই করব।

আল্লা যা করে ভালোর জন্যেই করে! রেসকোর্সে মিটিং করলে এমন জমা জমবে না, বাকি সবার চোখে ধাঁধা লেগে যাবে।

এই শোনো। আজ কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

কেন?

দেরি হলে প্রভোস্ট ভীষণ রেগে যাবে। শেষে আর কোনো দিনও বাইরে আসতে দেবে না।

কিন্তু আমার যে তোমার সঙ্গে অনেক অনেক কথা ছিল।

ছিল তো বুঝলাম। কিন্তু। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

কী?

কাল রাতে শহীদ মিনারের ওখানে এসো।

ওখানে কেন?

আমরা সবাই ওখানে আলপনা আঁকতে যাব। অনেক রাত পর্যন্ত থাকব। ইচ্ছেমতো কথা বলা যাবে।

তোমাদের প্রভোস্ট কি অত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে দেবে?

দেবে না মানে। বিশ আর একুশে বাধা দিলে ওর হাল খারাপ করে দেব না আমরা।

স্যার।

কী?

ছাত্ররা সব ঘন ঘন আসছে যাচ্ছে।

কেন? কেন? ছাত্ররা কেন আসছে?

বিজ্ঞাপন চাইছে!

কিসের বিজ্ঞাপন?

একুশে ফেব্রুয়ারিতে সবাই সংকলন বের করছে কিনা।

হুঁ। এক কাজ করুন। এ বছরটা জয় বাংলার বছর। কাউকে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। আমি একটা ফান্ড স্যাংশন করে দিচ্ছি। ওখান থেকে সবাইকে কিছুকিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়ে দেন। এতে আমাদের কোম্পানির গুডউইল আরো বেড়ে যাবে। আর শুনুন।

ইয়েস স্যার।

আপনার পরিচিত কোনো কবিটবি আছে?

কেন স্যার?

না, ভাবছিলাম, শহীদদের ওপরে চার লাইন কবিতা লিখে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করলে—

সেটা নিয়ে ভাববেন না স্যার। সেটা আমি নিজেই লিখে দিতে পারব স্যার। আপনি জানেন না স্যার, আমারও একটু-আধটু লেখার অভ্যাস আছে স্যার।

তাহলে তাই করুন।

আরেকটা কথা ছিল স্যার।

কী?

আমাদের ওই পিয়নটা স্যার। এবারের ঘূর্ণিঝড়ে ওর ঘর-বাড়ি সব শেষ হয়ে গেছে স্যার। ও একমাসের বেতন এডভান্স চাইছে স্যার!

কিসের মধ্যে কী নিয়ে এলেন। যা বললাম তাই করুন গিয়ে এখন। ওসব আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না। বলে দিন হবে না।

কটা ভেঙেছিস?

চারটা।

তুই?

আমি পাঁচটা গাড়ির নম্বরপ্লেট। আর সতেরটা সাইনবোর্ড।

জানিস, আমাদের পাড়ার সেই মোটা সাহেবটা, ওই-যে সেই লোকটা যার মেয়ের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলাম বলে আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল। মনে নেই তোর? সেই তখন থেকে ঘাপটি মেরে বসে আছি। দাঁড়াও একুশে ফেব্রুয়ারি আসুক। গাড়িতে ইংরেজি নম্বরপ্লেট। নাক খসে দেব না? দিলাম, শালার গাড়িসুদ্ধ ভেঙে দিয়েছি।

ঠিক করেছিস। শালার আমরা সংস্কৃতি সংস্কৃতি করে জান দিয়ে ফেললাম। আর ব্যাটারা ইংরেজি নাম্বার লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে। ঠিক করেছিস।

[আগামী দিনে যে-সংলাপ শুনব। পথে-প্রান্তরে যে-সংলাপ মুখে-মুখে উচ্চারিত হবে]

বছরে কতদিন?

তিনশ' পয়ষট্টি দিন।

তিনশ' পয়ষট্টি দিনে ক'টা শহীদ দিবস?

দুশো বিরানব্বইটা।

বাকি থাকে ক'টা?

তিয়াত্তরটা।

তিয়াত্তরটা আর বাকি রেখে কী হবে?

ওগুলোও ভরে ফেলো।

আগুন জ্বালো।

আবার আগুন জ্বালো।

পুরো দেশটায় আগুন জ্বালিয়ে দাও।

সাতকোটি লোক আছে।

তার মধ্যে নাহয় তিনকোটি মারা যাবে।

বাকি চারকোটি সুখে থাকুক। শান্তিতে থাকুক।

পুরো বছরটাকে শহীদ দিবস পালন করুক ওরা!

রচনাকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

দেমাক

লোকটাকে দেখলেই গা জ্বালা করে রহমতের।

গর্বে মাটিতে যেন পা পড়তে চায় না লোকটার।

লম্বা সুঠাম দেহ। দেড় হাত চওড়া বুক। মাংসল হাত দুটো ইস্পাত-কঠিন। বড় বড় চোখ দুটোতে সব সময় রক্ত যেন টগবগ করে। গায়ের রঙটা কালো কুচকুচে। চামড়াটা ঠিক কাকের পাখনার মতো মসৃণ আর তেলতেলে। গর্বে মাটিতে যেন পা পড়তে চায় না লোকটার। সকালে ভোরে-ভোরে উঠে কাজে বেরিয়ে যায়। রাত দশটায় ঘরে ফেরে। হাতমুখ ধুয়ে ভাত খায়। তারপর নিজ হাতে তৈরি আমকাঠের ইজিচেয়ারটাকে দাওয়ায় টেনে এনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে। বসে বসে 'কিংস্টর্ক' সিগারেট ফোঁকে।

লোকটাকে দেখলেই গা-জ্বালা করে ওঠে রহমতের। মনে মনে ঈর্ষা হয়, শুধু তার প্রতি নয়; তার গোটা পরিবারটাই ওর কাছে ঈর্ষার বস্তু।

সেদিন রাতেও ভাত খেয়ে বারান্দায় বসে-বসে লোকটা যখন সিগারেট ফুঁকছিল, তখন জানালার ফাঁক দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রাগে গজগজ করছিল রহমত। স্ত্রী মেহেরুনকে ডেকে এনে দেখাচ্ছিল। দেখ দেখ শা'র বাবুয়ানা দেখ। পায়ের উপর পা তুলে কেমন চুরুট টানছে। যেন নবাব সলিমুল্লার নাতি আর কী।

ইস্। দেমাক কত। মেহেরুন তার ঠোঁট-মুখ বিকৃত করেছিল। দেমাকের আর জায়গা পায় না। এত দেমাক থাকবে না, থাকবে না। তারপর একটু থেমে আবার বলেছিল, বাসের ড্রাইভার, তার আবার এত দেমাক কেন?

রহমত এর উত্তরে কিছু বলেনি। শুধু নীরবে দাঁতে দাঁত ঘষেছিল একটানা অনেকক্ষণ। আর মনে মনে লোকটার বংশ নিপাত করেছিল।

লোকটাকে সবাই চেনে এ-পাড়ার। বাস-ড্রাইভার রহিম শেখ। রহিম শেখ বাস চালায়। টাউন সার্ভিসের বাস। ওর কোনো ধরাবাঁধা বেতন নেই। দৈনিক যা টিকেট বিক্রি হয় তা থেকে পেট্রোল খরচ আর মালিকের কমিশন বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা কন্ডাক্টর, সে আর যে-ছোকরাটাকে নবাবপুর—স্টেশন—হাইকোর্ট বলে চিৎকার করবার জন্যে রাখে, সে ভাগ করে নেয়। টাকা যে খুব পায় তা নয়। তবু সেই অল্প ক'টা টাকা কাপড়ের ব্যাগে পুরে যখন সে বাসায় ফেরে, তখন এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে মন-প্রাণ ভরে থাকে রহিম শেখের। কাজ তার গর্ব। কাজ করেই খায় সে। পরের কাছে হাত পাতে না। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না। কিংবা তাদের ওই বাসের মালিকটার মতো পুঁজি খাটিয়ে বসে বসে মুনাফা লুটে না। কাজ করেই খায় সে। কাজ তার গর্ব।

বাসায় বউ আছে তার। আমেনা। বাড়িতে অবসর সময় বেতের ডালা, বাস্কেট আর মাদুর তৈরি করে সে। পরে স্বামীর হাতে বাজারে বিক্রি করতে পাঠায়। ছেলেমেয়েও কম

নয়। তিন মেয়ে, দুই ছেলে। বড় মেয়ে মুন্নির বয়স এবার চৌদ্দয় পড়ল। ওর পায়রা পোষার শখ। সেই বছর তিনেক আগে মেয়ের আবদার রাখতে গিয়ে বাজার থেকে একজোড়া খয়েরি রঙ-এর পায়রা এনে দিয়েছিল রহিম শেখ। সেই একজোড়া বংশানুক্রমিকভাবে বৃদ্ধি পেতে-পেতে এখন বারো জোড়ায় পৌঁছেছে। সারাদিন ওদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে মুন্নি। ওদের ঘরগুলো ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়া। খাওয়ানো। নতুন বাচ্চাগুলোর দেখাশুনা করা। সকাল আর বিকেলে পায়রাগুলো একবার করে আকাশে উড়িয়ে দেয়া। সন্ধ্যাবেলা বাসায় ঢুকলে সযত্নে খোপের দরজাগুলো একে-একে বন্ধ করে দেয়া। ওদের নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত তাকে মুন্নি। কিন্তু পায়রাগুলো ওর বড় বজ্জাত। মাঝে মাঝে দল বেঁধে মেহেরুনের ঘরে ঢুকে ওর চালডাল খেয়ে ফেলে। দেখলে রেগে আগুন হয়ে যায় মেহেরুন। প্রথমে পায়রাগুলোকে গালিগালাজ করে। যমের হাতে দেয়, তারপর উঁচু গলায় পায়রার মালিকের [illegible] আক্রমণ চালায়। সব শেষে গোটা পরিবারটার ওপরই রাগে ফেটে পড়ে মেহেরুন। এ তার রোজকার অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। এইতো সেদিন ভরদুপুরে কী গালাগালিটাই না পাড়ছিল সে। মুন্নি তখন সবে গোসল সেরে ভেজা চুলগুলো রোদে শুকুচ্ছিল বসে বসে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই মেয়ে সামলে কথা বল্ বলছি, নইলে ভালো হবে না, কবুতরে চাল খেয়েছে তো আমরা কী করব অ্যাঁ?

কী করবো মানে, বেঁধে রাখতে পার না?

ওগুলো কি গরু-ছাগল যে বেঁধে রাখব?

বেঁধে না রাখতে পারলে, পুষবার এত শখ কেন শুনি? অন্যের ঘরে ঢুকে যখন-তখন চালডাল খেয়ে ফেলে—নষ্ট করে, বলি চালডালগুলো কিনতে কি পয়সা লাগে না, না মাগনায় পাই?

এরপর আরো কিছুক্ষণ উভয়ের তরফ থেকে তর্কবিতর্ক চলেছিল। সবশেষে খোদাকে সাক্ষী রেখে মেহেরুন প্রতিজ্ঞা করেছিল। দেখ মুন্নি, এবার যদি তোর কবুতর আমার চালডাল খায়, তাহলে সেই কবুতরের জান আমি রাখব না হুঁ।

মুন্নি ঠোঁট উলটিয়ে বলেছিলে, ইস এত সস্তা না।

কিন্তু মেহেরুনের কাছে ব্যাপারটা খুব যে সস্তা তা বিকেলেই টের পেয়েছিল মুন্নি। সাদা-কালো রঙ মেশানো পায়রাজোড়া বাসায় ফেরেনি।

এদিক-ওদিক তালাশ করল মুন্নি। আমেনাও নিজের কাজ ফেলে রেখে, মেয়ের সাথে তালাশে নামল। অন্ধকার ঘন হয়ে এল, তবু পায়রাজোড়ার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল মুন্নির। মেহেরুনের ঘরের চারপাশে সতর্কভাবে বারকয়েক ঘুরাফেরা করল সে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। কিন্তু ঘরের ভেতর জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে।

রাতে রহিম শেখ বাসায় ফিরলে, আমেনা সবকিছু খুলে বলল তাকে। মুন্নি তখন পায়রার শোকে বসে বসে কাঁদছিল দাওয়ায়। সবকিছু শুনে মেয়ের দিকে একপলক

তাকাল রহিম শেখ। রাগে ছ'ফুট লম্বা দেহটা তার থরথর কেঁপে উঠল। অন্ধকার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে গালিগালাজ যা-কিছু জীবনের সঞ্চয় সব উজাড় করে দিল সে রহমত আর মেহেরুনের উদ্দেশ্যে। পরে রাগটা একটু কমে এলে শ্বাস টেনে-টেনে বলল, হারাম খেতে-খেতে এদের হারাম খাওয়ার একটা অভ্যেস হয়ে গেছে। শক্ত-সমর্থ জোয়ান মানুষ, কাজকর্ম একটা কিছু করে খাবে না-তো চুরিচামারি করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে খায়। শা—যাবি সব জাহান্নামে।

হয়েছে যাক তুমি এসো, মেয়েকে নিয়ে এখন ভাত খাও। আমেনা স্বামীকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল।

অনেক রাতে, জানালা আর কপাট বন্ধকরা পাকের ঘরটায় বসে কবুতরের ঝোল দিয়ে মজা করে ভাত খেয়েছিল সেদিন রহমত আর মেহেরুন। একমুখ ভাত চিবুতে চিবুতে মেহেরুন বলেছিল, যা করেছি ঠিক করেছি, কি বল?

হ্যাঁ, ঠিক। রহমত সায় দিয়েছিল। ব্যাটা বাসের ড্রাইভার বলে কিনা আমরা হারাম খাই। শা—তুমি যেমন ড্রাইভারি করে রোজগার কর; আমিও তেমন মানুষের হাত দেখে পয়সা কামাই। তোমারটা যদি হালাল হয়, আমারটা হারাম হতে যাবে কেন?

ঠিকই তো। মেহেরুন সমর্থন জানিয়েছিল তাকে। আর লোকটার দেমাক দ্যাখো না। কালকে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েকে বলছিল, ভিক্ষে করা পয়সা নয় আমার। গায়ে খেটে রোজগার করি। একটা ফুটো পয়সারও আমার দাম আছে। শা—দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। রহমত মুখ বিকৃত করেছিল।

কথায় কথা বেড়েছিল। আলাপ চলছিল অনেকক্ষণ।

মাঝখানে অনেকগুলো দিন।

দুটি পরিবারের জীবন এমনি করেই এগুচ্ছিল। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটল। দুর্ঘটনা ঘটল রহিম শেখের জীবনে। প্রথম দুর্ঘটনা।

এর আগে পরপর কটা দিন একটানা ধর্মঘট করেছিল ওরা। কমিশন কমানোর দাবিতে ধর্মঘট। আর ধর্মঘট শেষ হবার দিন-চারেক পর সকালে, আর আর দিনের মতো বাস নিয়ে বেরিয়েছিল রহিম শেখ। লম্বা, সুঠাম দেহ। মাংসল হাতদুটো ইস্পাত কঠিন। বড় বড় চোখদুটো রক্তজবার মতো লাল। বাসটা ঠিকই চালাচ্ছিল রহিম শেখ। কিন্তু হঠাৎ সামনের ট্রাককে পাশ কাটাতে যেতেই, তীব্রবেগে বাসটা গিয়ে ধাক্কা খেল রাস্তার পাশের একটা ল্যাম্পপোস্টের সাথে। পরক্ষণেই সামনের কাচভাঙার ঝনঝন শব্দ। দু-হাতে চোখদুটো চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল রহিম শেখ। লাল চোখ বেয়ে লাল রক্তের স্রোত নেমে এল তার।

বাসায় সবাই যখন এ খবর পেল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

মুন্নিকে সাথে নিয়ে হাসপাতালে তাকে দেখতে গেল আমেনা। অনেক খোঁজ-খবরের পর সন্ধান মিলল তার। চোখেমুখে ব্যান্ডেজ-আঁটা, নিসাড় হয়ে শুয়ে আছে সে।

পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি। গলা দিয়ে কথা সরছিল না আমেনার।

একটু নড়েচড়ে রহিম শেখ আবার বলল, সাথে আর কেউ আসেনি?

এসেছে।

কে?

আমি বাবা। মুন্নি এগিয়ে গিয়ে বাবার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিল। চোখ দুটো তার পানিতে টলমল করছে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ ব্যান্ডেজ-বাঁধা চোখদুটো দুহাতে চেপে ধরে আর্তকণ্ঠে রহিম শেখ বলে উঠল, উহ্। আমি সব হারিয়েছি। সব হারিয়েছি। এবার আমি কী করে বেঁচে থাকব?

কাপড়ের খুঁটে চোখের পানি মুছে নিয়ে আমেনা বলল, ওগো, খোদা না করুন, সত্যিই যদি তেমন কিছু হয়, তুমি ঘাবড়িয়ো না। আমি আছি, দুবেলা চারটে ভাত যাতে জোটে সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

আমেনার কথায় মনকে সান্ত্বনা দিতে পারল না রহিম শেখ। প্রশান্তভাবে বারকয়েক মাথা নাড়ল সে।

খবর পেয়ে রহমতও দেখতে এসেছিল তাকে। মেহেরুন্ন বলেছিল লোকটার সাথে যত শত্রুতাই থাক না কেন, হাজার হোক, সে আমাদের প্রতিবেশী, তাকে একবার দেখে আসা উচিত।

হ্যাঁ কথাটা মিথ্যে বলোনি। রহমত সায় দিয়েছিল তার কথায়। আজকাল কিন্তু রহিম শেখকে দেখলে তার প্রতি আর ঘৃণা বোধ হয় না রহমতের। আর ভয় লাগে না তাকে। বরঞ্চ তার প্রতি আজকাল অনুকম্পা জাগে ওর। করুণা হয়। হবেই বা না কেন? লোকটা তো আগের মতো আর দেমাক দেখিয়ে বেড়ায় না। দুটো চোখই হারিয়েছে সে। চোখ গেলে আর দুনিয়াতে কী-ই বা থাকে মানুষের। চাকরিটাও গেছে তার। এখন তো আর দশজনের বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয় সে। এই ভেবে তার প্রতি করুণা জাগে রহমতের। দয়া হয়। সেই লম্বা সুঠাম দেহটা যেন কেঁচোর মতো কুঁচকে এট্টুখানি হয়ে গেছে। মাথা উঁচিয়ে আজকাল আর চলতে পারে না সে। দাওয়ায় বসে ঝিমোয়।

ক'দিন থেকে রহমত লক্ষ করছিল, ভোর-সকালে উঠে ছোট্ট ছেলেটার কাঁধে হাত দিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে যায় রহিম শেখ। অনেক রাত করে বাসায় ফিরে। তারপর দাওয়ায় পিদিমের আলোতে বসে বসে, মুন্নির হাতে থলে থেকে বের-করা ফুটো পয়সা, আধ আনি, একআনি সব হিসেব করায়।

ব্যাপার কী, অ্যাঁ? মেহেরুন্নকে একদিন জিজ্ঞেস করল রহমত। মেহেরুন্ন গালে হাত দিয়ে বলল, খোদা মালুম। আমি কি জানি। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, কী আর করবে, ভিখ মাগতে যায় আর কী। বলতে গিয়ে একটুকরো হাসি দোল খেয়ে উঠল ঠোঁটের কোণে। রহমতও হাসল। সূক্ষ্ম সুতোর মতো মিহি হাসি।

সে দিনটা ছিল রোববার। রোববারে অফিস-আদালত সব বন্ধ থাকে। আর তাই ওদিনটা রহমতের রোজগার বেশ বেড়ে যায়। কেরানিবাবুরা সব হাত দেখাবার জন্য ভিড় জমিয়ে ফেলে। কারো বা প্রমোশন। কারো বিয়ে। আবার কেউ কেউ ছেলেপুলের সংখ্যা জানতে চায়।

সবদিন একজায়গায় বসে না রহমত। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসে।

সেদিন সদরঘাটের মোড়ে বসবে বলেই ঠিক করল সে। জায়গাটা খুব ব্যস্তসমস্ত। লোকজনের চলাফেরা খুব বেশি। ছুটির দিনে তো এমন ভিড় লাগে, মনে হয় যেন একটা হাট বসেছে।

রাস্তার পাশে একটা ভালো জায়গা ঠিক করে নিয়ে বসে পড়ল রহমত। পাশেই একটা খোঁড়া আর একটা শীর্ণকায় মেয়ে ছোট্ট একটা টিন হাতে ভিখ মারতে বসেছে। এ বাবু চারটে পয়সা দাও বাবু, দুদিন কিছু খাইনি বাবু, চারটে পয়সা দাও।

অদূরে খবরের কাগজের হকাররা সব চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, ইত্তেফাক—আজাদ—মর্নিং নিউজ। হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল রহমত। তাকিয়ে দেখল, চৌরাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টটার নিচে দাঁড়িয়ে রহিম শেখ। হাতে তার একগাদা কাগজ। ঊর্ধ্বে একখানা কাগজ তুলে ধরে সে জোর গলায় হাঁকছে, গরম খবর সাব—গরম খবর। ইত্তেফাক—আজাদ—মর্নিং নিউজ—গরম খবর সাব—গরম খবর।

ইস, দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়তে চায় না লোকটার!

ম্যাসাকার

ওরা আমার কে ছিল? বন্ধু-বান্ধব? কিছুই নয়, তবু ওদের স্মৃতি আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে প্রাণহীন করে তুলেছে কেন?

মানুষের মৃত্যু! সে তো এক চিরন্তন সত্য। মৃত্যু আছে বলেই সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। আবার নবনব সৃষ্টিই মানুষকে যুগে যুগে উৎসাহ, উদ্দীপনা আর প্রেরণা দিয়ে এসেছে।

কিন্তু তবুও ওদের মৃত্যুতে আমি এত ব্যথাতুর কেন? কত শত দুর্ভিক্ষ, মহামারী আমি ডিঙিয়ে এসেছি, কত লাখো হাজার মাংসহীন দেহকে রাস্তার আনাচে-কানাচে পড়ে থাকতে দেখেছি দু-মুঠো ভাতের অভাবে, দিনের পর দিন তিলে তিলে—শুকিয়ে শুকিয়ে মানুষ কেমন করে মরে, তাও আমি দেখেছি। দীর্ঘশ্বাসের অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়িয়ে আমি কতবার প্রত্যক্ষ করেছি—আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপড়শি অনেকেই চলে যাচ্ছে, মৃত্যুপথের মিছিল ধরে, চোখের জল চোখে শুকিয়ে; নতুনকে আলিঙ্গন করে নিয়েছি, পুরাতনের সমাধির পাশে বসে, জীবনকে প্রাণহীন হতে দিইনি কিছুতেই। কিন্তু আজ আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি কেন? যুদ্ধক্ষেত্রের এই বীভৎস রঙ্গমঞ্চে প্রতিটি সৈনিকের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছে শত্রুসৈন্যের রক্ত পানেচ্ছায়। আমি এত নিস্তেজ কেন?

অনেক কষ্ট করে কতকগুলো ফুলের চারাগাছ সংগ্রহ করেছি, ওদের কবরের শিয়রে যেখানে ক্রুশগুলো গাড়ানো আছে, তার একপাশে পুঁতে দেব বলে। এ গাছগুলো একদিন বড় হবে। ওতে ফুল ফুটবে, আর সে ফুলগুলো এক-একটা করে ঝরে পড়বে ওদের কবরের ওপর; ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে কবরের মানুষগুলো সব জেগে উঠবে, ফুল ওদের শোনাবে শান্তির আগমন বাণী; ওদের বিক্ষুব্ধ আত্মা শান্তি পাবে, ওরা শান্তি পাবে।

স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন রাত্রেও আজকের মতো ভীষণ শীত পড়েছিল। গরমের দেশের লোক আমরা, এত শীত আমাদের সইবে কেন? দুটোর ওপর চারটে কম্বল চাপিয়েও বিছানায় শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম।

ফ্রন্ট থেকে মাত্র অল্পকয়েক মাইল দূরে মিলিটারি হাসপাতালের ডাক্তার আমি। রাত্রে মাত্র চারঘণ্টার বিশ্রাম। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুম চলে আসে! কিন্তু সেদিন এর ব্যতিক্রম হল, ঘুম এল না। নানারকম এলোমেলো চিন্তা এসে মাথায় গিজগিজ করতে লাগল। রেডিয়াম ঘড়িতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা ঘণ্টা এর মধ্যেই কেটে গেছে। আর মাত্র তিনটে ঘণ্টা বাকি আছে, কিন্তু ঘুম এখনো এল না। চমকে উঠলাম, ঘুম! আমি জানি, নিশ্চিত করে জানি, একজন ষোল বছরের কচি ছেলে আজ রাত ভোর হবার আগেই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়বে। পৃথিবীর সমস্ত গোলা-বারুদ যদি একসাথে শব্দ করে ওঠে তবুও তার সে ঘুম ভাঙবে না।

যেদিন তাকে প্রথম দেখেছিলাম, সেদিন থেকেই জানতাম, ওর বাঁচবার কোনো আশা নেই। সকরুণ দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকিয়ে ব্যথিতস্বরে বলেছিল—ডাক্তার, আমার বাঁচবার কি কোনো আশা নেই, ডাক্তার! জানতাম বুকের পাঁজরে গুলি লাগলে সে রোগীকে বাঁচানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, তবুও তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম—ভয় করবার কিছু নেই, নিশ্চয়ই তুমি ভালো হয়ে যাবে।

বেদনায়-ভরা মুখখানা ওর আশার ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই তা ম্লান হয়ে গেল। যখন সে একটা অসহনীয় বেদনা অনুভব করল বুকের নিচে—এক গ্লাস জল। ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, জল নিয়ে এল নার্স, কিন্তু এক ফোঁটা জলও তার ভাগ্যে জুটল না, গ্লাস ভরে গেল উষ্ণ রক্তে, রক্ত বমন আরম্ভ হল ওর, ভীতবিহ্বল চোখ দুটো বেয়ে এবার নামল অশ্রুর বন্যা, কিছুতেই তাকে সান্ত্বনা দেয়া গেল না, বললাম—কেঁদো না জর্জ, কাঁদলে শরীর আরও খারাপ হয়ে যাবে।

আমায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না ডাক্তার। আমি জানি, আমার বাঁচবার কোনো আশা নেই, ক্ষুব্ধ অভিমানে ও চাপা আর্তনাদ করে উঠল।

ষোলো বছরের এক কচি বালক। ফুল সবেমাত্র পাপড়ি মেলছিল, ওর সম্মুখে ছিল আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু—না ফুটতেই পাপড়ি ঝরে গেল। পুওর জর্জ।

উহ্! ওর কথাগুলো আজও বারবার আমার কানের ওপর মর্মর বেদনার সৃষ্টি করছে,—জানো ডাক্তার! এরা আমার জোর করে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরে নিয়ে এসেছে। এরা আমায়—এরা আমায় জোর করে আমার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে।

কথা বলো না জর্জ! কথা বলা নিষেধ। কিন্তু আমার মানা সত্ত্বেও সে থামল না। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, কথা বলতে ওর কষ্ট হচ্ছে, তবুও সে আপনমনে বলে চলল—হ্যাঁ আমি নিশ্চয়ই মরে যাব! আমার মা, ছোট ভাইবোন, কাউকে আমি দেখব না, কাউকে আমি আর দেখব না। কান্নায় ওর গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল।

ঘুম আর আসবে না জানি, যা একটু তন্দ্রা এসেছিল, তাও ছুটে গেল, চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্তনের ধাক্কায়। গুলির শব্দে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু যে-দৃশ্যটা দেখলাম সে-দৃশ্য দেখে পাষাণেরও চোখে জল আসে।

এডোয়ার্ড বলেছিল নিজহাতে সে তার জীবনের যবনিকা টেনে দেবে। যে বাঁচার ভেতর সার্থকতা নেই, যে জীবনের ভেতর এতটুকু মধুরতা নেই, সে জীবনের ঘানি টেনে কী লাভ ডাক্তার? বারবার আক্ষেপ করেছিল এডোয়ার্ড। বেচারা তার দুটো চোখই হারিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মুখটা এমন কদাকার হয়ে গিয়েছিল যে, দেখলে ভয় হত। একসময় সে-যে খুব সুশ্রী ছিল তা তার মুখের এক পাশেকার সুস্থ স্থানটুকু দেখলেই বোঝা যেত।

এডোয়ার্ড বলেছিল, গত জুলাই মাসে ওর বিয়ে হবার কথা ছিল ম্যারিয়ানার সাথে। ম্যারিয়ানা! রুদ্ধ হয়ে এল এডোয়ার্ডের কণ্ঠস্বর। লাজুক মেয়ে ম্যারিয়ানা। ছোটকাল

থেকে একসাথেই আমরা বড় হয়েছিলাম। জানালার বাইরে অন্ধদৃষ্টি মেলে এডোয়ার্ড বলল।...আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতাম। আমাদের গার্জেনরা তার যথোচিত মর্যাদা দিয়েছিলেন, আমাদের বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে। বারকয়েক ঢোক গিলল এডোয়ার্ড, ডাক্তার! তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ, তখন আমাদের অন্তরে কেমন খুশির বন্যা বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু—কিন্তু! দাঁতে দাঁত চেপে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। কিন্তু এ কী হল ডাক্তার! আমার সে জীবন কোথায় গেল? আমি জানি, আমার সে জীবন আর ফিরে আসবার নয়, সে আর ফিরে আসবে না।

জর্জের মতো এডোয়ার্ড অল্পবয়স্ক ছিল না, তাই চোখের জলকে সে সামলে নিয়েছিল।

যুদ্ধে এলে কেন? হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেছিলাম।

হ্যাঁ যুদ্ধে কেন এলাম। মাথা নাড়তে নাড়তে আপনমনেই বলল সে।—কিন্তু, তুমি ম্যারিয়ানার কথাটারই পুনরাবৃত্তি করলে ডাক্তার। ম্যারিয়ানাও বলেছিল, কেন যুদ্ধে যাবে? যুদ্ধ করে তোমার কী লাভ? সে দিন প্রথম ম্যারিয়ানার চোখে জল দেখেছিলাম, ও ভীষণ কেঁদেছিল আর বলেছিল, যুদ্ধে যেয়ো না এডোয়ার্ড! যুদ্ধে আমাদের কোনো দরকার নেই। কিন্তু ম্যারিয়ানা জানত না যে, আমাদের সরকার সৈন্যবৃত্তি গ্রহণ করাটাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, যুদ্ধ করবার ইচ্ছা থাকুক কিংবা না-থাকুক, সবার গলায় একটা করে ব্রেনগান ঝুলিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়া চাই-ই। আজ বারবার মনে হচ্ছে, ম্যারিয়ানা ঠিকই বলেছিল যুদ্ধে আমাদের কী লাভ? বুলেটের সামনে, কুকুর-বেড়ালের মতো মরা, তীব্র সেলের আঘাতে হাত-পা আর চোখ হারিয়ে চিরতরে অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী পুরস্কারই আমরা পেয়ে থাকি?

একটুখানি চুপ করে এডোয়ার্ড আবার বলল—আমি জানি, ম্যারিয়ানা আর আমায় গ্রহণ করবে না।

নিশ্চয়ই সে গ্রহণ করবে। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম।

না—না—না, কী বলতে গিয়ে এডোয়ার্ড থেমে গেল। তারপর অনেকক্ষণ কী চিন্তা করে ধীরে ধীরে বলল, হ্যাঁ, ম্যারিয়ানা হয়তো আমায় গ্রহণ করবে। কিন্তু নিশ্চয়ই সে আমায় নিয়ে সুখী হতে পারবে না, উহ্। আমি সবকিছু হারিয়েছি।

তখন বিশ্বাস হয়নি এডোয়ার্ডের কথা; কিন্তু যখন রক্তাপ্লুত মেঝের ওপর তাকে রিভলবার হাতে পড়ে থাকতে দেখলাম, তখুনি বিশ্বাস করতে পারছিলাম যে, এডোয়ার্ড আত্মহত্যা করেছে। রিভলবারের গুলিতে মাথার হাড়গুলো চারদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

এডোয়ার্ডের উত্তপ্ত মস্তিষ্কগুলোকে যখন মেঝের ওপর থেকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করা হচ্ছিল, তখনি জর্জ প্রলাপ বকতে আরম্ভ করল।

—এরা আমার বাবাকে মেরেছে, আমার চার ভাইকে ধরে ধরে এরা কামানের মুখে জুড়ে দিয়েছে, আমায়ও মারল এবং এরা আমায় বাঁচতে দিল না। এরা কাউকে বাঁচতে দেবে না। সবাইকে মেরে ছাড়বে এরা। সবাইকে।

দুয়ারে মৃদু শব্দ হতে চমক ভাঙল আমার। ঘড়িতে তিনটা বেজে গেছে। আমার পাওনা চারটে ঘণ্টার মধ্যে তিনটেই শেষ। এবার কে যেন দুয়ারে আরো জোরে শব্দ করল, ওয়ার্ড ইনচার্জ-এর গলা শুনতে পেলাম,—মি. চৌধুরী শিগ্‌গির আসুন! চল্লিশ নম্বর সিটের রোগীটার অবস্থা ভীষণ খারাপ, ও আপনাকে খুঁজছে।

চল্লিশ নম্বর সিট! হ্যাঁ জর্জের সিট নম্বর চল্লিশ। কিন্তু, সে আমায় খুঁজছে কেন? দেরি নয়, আলেস্টারটা গায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

মৃত্যুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ওর ওপর, নিস্তেজ হয়ে এসেছে ওর দেহ। ওর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, অতি জোর করেই বুঝি ও চোখ দুটিকে মেলে, একবার চারদিকে চাইল। আমার সাথে চোখাচোখি হতেই একটুকরো ম্লান হাসি হেসে, ইশারা করে কাছে ডাকল। আমার মুখটাকে জোর করে টেনে নিয়ে ও ওর মুখের ওপর রাখল। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মৃদুস্বরে কানে কানে বলল,—আশীর্বাদ করো ডাক্তার। এরপর যেন এমন একটা দেশে জন্মাই, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে এমন করে বলি দেয়া হয় না। আশীর্বাদ করো ডাক্তার। আ......। কথা বন্ধ হয়ে গেল চিরতরে। আরও কী বলতে চেয়েছিল ও, কিন্তু পারল না। আশ্চর্য হলাম আমি, এ কয়টা কথা বলতেই কি সে এতক্ষণ মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বেঁচেছিল। কিন্তু এ তো শুধু কথা নয়, ওর অন্তিম মুহূর্তের একাগ্র বাসনা।

এডোয়ার্ড আর জর্জের আত্মা চলে গেছে দূরে...সমুদ্রপারে, তাদের ছোট্ট গ্রামগুলোতে, বিরাটকায় সমুদ্রপোতের গহ্বরে ভরে যেখান থেকে তাদের চালান দেয়া হয়েছিল, দেয়া হয়েছিল যুদ্ধের শিকার হিসেবে বধ্যভূমির দিকে।

উহ্! হে বিধাতা, যদি সত্যিই তুমি থেকে থাকো, তাহলে ওদের ক্ষমা করো না। উগ্র সাম্রাজ্যলোলুপতায় যারা লাখো লাখো সহায়-সম্বলহীন নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করে। কোটি কোটি নারীকে বৈধব্যের বেশ পরিয়ে দুঃখের হোমানলে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারে। তাদের তুমি ক্ষমা করো না। বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল প্রশস্ত কপাল। অবাক হয়ে গিয়েছি বৃদ্ধ লুইয়ের কথায়।

আর, রক্তপিপাসু, সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করার জন্য যাঁরা লড়াই করে, তাদের তুমি আরও শক্তি দাও প্রভু! তাদের তুমি আরও সাহস দাও।

কিন্তু আর দেরি নয়। রাত্রি প্রভাত হয়ে এল প্রায়। ঘণ্টাকয়েক মাত্র বাকি, যুদ্ধশ্রান্ত সৈনিকেরা সব এখন বিশ্রাম নিচ্ছে, সকালের আক্রমণ আরো শক্তিশালী করবার জন্য।

ফুলের চারাগাছগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম, বাইরের উন্মুক্ত প্রান্তরে। বাঁ দিকে একটু এগিয়ে গেলেই সৈন্যদের গোরস্তান; সেখানেই আছে জর্জ, এডোয়ার্ডের কবর ও লুইয়ের সমাধি।

কে.....ও? সরে গেল জর্জ, এডোয়ার্ড আর লুইয়ের কবরের পাশ থেকে?

আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই জানি, কিন্তু, এ কিশোরী মেয়ে কোত্থেকে এল, এখানে?

আমাকে কিছু ভাবতে না দিয়েই ও হাত দিয়ে আমায় কাছে ডাকল। তারপর চোখ দিয়ে ইশারায় বলল—পিছে পিছে এসো। ও চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু, এক অপরিচিত মেয়ের পেছনে পেছনে আমি যাব কেন?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ও ফিরে দাঁড়াল, ধীরে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, উহ্? কী তীব্র চাহনি। চোখ দুটো ঝলসে উঠল আমার, চাপা আর্তনাদ করে উঠলাম,—আসছি। তারপর পিছে পিছে এগিয়ে চললাম। একটা কথাও বলল না কিশোরী মেয়েটি। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। কোথায়? এবং কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে?

কিসের পচা ভেপসা গন্ধ ভেসে এল নাকে, হাত দিয়ে রুমালটা বের করে আনলাম পকেট থেকে, ক্রমশ আরও তীব্রতর হয়ে আসছে গন্ধটা। বমি করবার উপক্রম হল আমার। তবুও এগিয়ে চললাম ধীরে ধীরে।

একসময়ে মেয়েটা পিছন ফিরে দাঁড়াল। অবাক হলাম, একটু আগে যে-চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল এখন সে চোখদুটোকে কত শান্ত, স্নিগ্ধ আর আবেগপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে— তুমি এখানে কী কাজ করো? মেয়েটির গলার স্বর আমার কানে সেতারের ঝঙ্কার দিয়ে গেল, বিস্ময়ে কপালের রেখাগুলো কুঁচকে এল আমার। কে......এ নারী! সাধারণ মহিলা, না দেবী?

মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম।

আমি এখানে ডাক্তারি করি।

ডাক্তারি করো? আমাকে ডাক্তার বলে মেয়েটির যেন বিশ্বাস হল না, এমনি ভাব করল সে, তারপর বলল—

ডাক্তার হয়ে তুমি এ গন্ধটা কিসের বলতে পারছ না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। নাকের উপর থেকে রুমালটা সরিয়ে নিয়ে ভালো করে গন্ধটা পরীক্ষা করে দেখলাম আমি, তারপর বললাম—নিশ্চয়ই কোনো জন্তু-জানোয়ার মরে পচে আছে।

হাঃ! হাঃ! হাঃ! মেয়েটির বিকট হাসিতে শিউরে উঠলাম আমি, মনে হল যেন রূপকথার কোনো এক রাক্ষুসে মূলোর মতো দাঁত বের করে আমাকে ব্যঙ্গ করল, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ, কতগুলো জন্তু-জানোয়ার ওখানে মরে পচে আছে। ভ্রু কুঁচকে কথা কয়টি বলে, এক অদ্ভুত বিজাতীয় হাসি টানল মেয়েটি। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা আক্রোশে বারবার উচ্চারণ করল সে, জানোয়ার! জানোয়ার! তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! পূর্ণদৃষ্টিতে মেয়েটি আবার তাকাল আমার দিকে। ভয়ে কাঠ হয়ে এল আমার সমস্ত শরীর। একি সেই শান্ত স্নিগ্ধ নারীমূর্তি! না এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড।

হ্যাঁ, ওরা জানোয়ারই তো! নইলে এমন করে মরবে কেন? মেয়েটি আবার বলল।

এতক্ষণে খেয়াল ভাঙল আমার। কোথায় চলেছি আমি? কোন্ মরীচিকার পথে? ফিরে দাঁড়ালাম আমি, কিন্তু এগোতে পারলাম না এক পা-ও। পেছন থেকে ডাক এল—ডাক্তার। কী অদ্ভুত করুণায় ভেজা সেই আহ্বান। তুমি বড্ড অস্বস্তিবোধ করছ, নয় কি ডাক্তার? কিন্তু তোমায় আমার বড্ড প্রয়োজন আছে ডাক্তার।

মেয়েটির চোখে অসংখ্য অনুরোধ।

সামনে এগিয়ে চলতে চলতে মেয়েটি আবার বলল—ওই যে, ওই দেখ ডাক্তার! জানোয়ারগুলো কেমন করে পড়ে আছে।

শিউরে উঠলাম আমি। সামনে যতদূর দেখা যায়, শুধু মৃতের স্তূপ। কোনো এক সময় হয়তো এরা মানুষ ছিল, কিন্তু সঙ্গীনের খোঁচায় আর বুলেটের আঘাতে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন বিকৃতি লাভ করেছে যে ওদের মানুষ বলে ভাবা দুঃসাধ্য।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হাঃ! হাঃ! হাঃ! সেই বিকট হাসি, মেজর কলিনসের দাঁত বের করা সেই প্রবল অট্টহাসি—হা...হাঃ...হাঃ! আর টেবিলে চপেটাঘাত করে বলা সেই কথাগুলো— Struggle for existence! —বাঁচবার জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাব! আর যত পারব শত্রুদের হত্যা করব। মানুষের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। মানুষ চাই না আমরা, আমরা চাই মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম খনিগুলো। সোনা ফলানো শস্যভূমি আর বড় বড় কারখানাগুলো, আর চীন ভারতের মতো কলোনিগুলো, যেখানে আমরা আমাদের সমস্ত রদ্দি মালগুলো চালাতে পারব। তার জন্য প্রয়োজন হলে আমরা রোগজীবাণু ছড়িয়ে দেব ওদের ঘরে ঘরে। এটম বোমা মেরে নিশ্চিহ্ন করে দেব ওদের। আর মেশিনগান দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব ওদের শান্তির কপোতকে।

কোন্ পাপিষ্ঠরা এ নিষ্পাপ মানুষগুলোক এমন করে হত্যা করেছে? নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথা কয়টি।

কী বললে ডাক্তার? মেয়েটি চকিতে আমার দিকে ফিরে চাইল। তুমি ওদের পাপিষ্ঠ বললে? কিন্তু ওরা এ কথা শুনলে তোমাকেও এমনি করে মারবে। এরা তোমার চেয়েও অতি সামান্য কথা বলেছিল, এরা শুধু বলেছিল আমরা যুদ্ধ চাই না। এ না-চাওয়াটাই এদের কাল হয়েছে, ওরা এদের এক-একটা করে ধরে এনে এখানে জড়ো করল; আর নির্বিবাদে টিপে দিল মেশিনগানের ট্রিগার।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মেয়েটি। দূর সমুদ্রের বাতাসে ওর চুলগুলো উড়তে আরম্ভ করেছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট দুটোকে কামড়িয়ে ধরে, পায়ের নিচেকার রক্তে-ভেজা মাটির দিকে চোখদুটো নামিয়ে কী যেন ভাবল, তারপর একসময়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—কিন্তু কেন? কেন আমরা যুদ্ধ করব? কাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব? ওরাওতো আমাদের মা, ভাই, বোনের মতো, ওদেরো ছেলেমেয়ে আছে, বাড়িতে সুন্দর ফুটফুটে বউ আছে, আরো আছে আত্মীয়পরিজন। ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, সাধ-স্বপ্ন আছে—যেমনটি আমাদের আছে। মানুষের কল্পিত একটা সীমারেখার এপারে-ওপারে বলেই কি আমরা পরস্পর শত্রু? তুমিই বলো ডাক্তার! সভ্যতার এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস। মানুষকে সে মানুষের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্ররোচনা দেয়।

আবার কিছুক্ষণ থামল মেয়েটি, দূরে পূর্বাকাশে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করছে, মেয়েটি একবার সেদিকে ফিরে চাইল, তারপর ক্ষুদ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যর্থতার তীব্র হুতাশনে ভেজা-কণ্ঠে মেয়েটি বলল—জীবনটা এ-রকম হল কেন ডাক্তার? কত স্বপ্ন ছিল আমার! যা নারীর চিরন্তন স্বপ্ন, একটা সুন্দর সুঠাম স্বামী, ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান ছেলে, আর ফূর্তির জোয়ারে ঘেরা ছোট্ট একটা ঘর। কিন্তু এ কী হল ডাক্তার? এ কী হল? যুদ্ধ আমাদের এ কী সর্বনাশ করল। টপটপ করে জল পড়ছিল ওর চোখ দিয়ে। সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পেলাম না—দেখ, দেখ ডাক্তার! ওই দু-বছরের ছেলেটি, সে ওদের কাছে কী অপরাধ করেছিল, যার জন্য এ ক্ষুদ্র দেহটাকে ওরা বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে? দু-হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম, এ দৃশ্য দেখবার নয়, কিছুতেই নয়।

এই মুহূর্তে আঠারো বছর আগেকার আর একটা ছবি, পাশাপাশি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে।

পথে পথে মোড়ে মোড়ে আর রাস্তার আনাচে-কানাচে বসে বসে ঠুকছে, রক্ত-মাংসহীন শবের দল; এক নয়, দুই নয়, হাজার হাজার। পথের কুকুর আর আকাশের শকুনদের ভোজসভা বসেছে নর্দমার পাশে। আধমরা মানুষগুলোকে টানা-হ্যাঁচড়া করে মহা-উল্লাসে ভক্ষণ করছে ওরা। দ্বিতীয় মহাসমর। আর দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত সোনার বাংলা, চারদিকে শুধু হাহাকার, অন্ন নেই! বস্ত্র নেই! নেই! নেই! কিছু নেই! শুধু আছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আর অভাব অনটন।

বলতে-না-বলতেই বাজার থেকে চাল-ডাল সবকিছু গেল অদৃশ্য হয়ে, আর হু-হু করে বেড়ে গেল জিনিসপত্রের দর। কালকের দু-পয়সার পাউরুটি রাত না-পোহাতেই হয়ে গেল দু-আনা। তারপর চার আনা। পাঁচ টাকা মণের চাল তা কিনা চোখের পলক না ফেলতেই গিয়ে ঠেকল পঞ্চাশের কোঠায়।

চিতার পর চিতা জ্বলে উঠল সোনা ফলানোর দেশের পল্লীতে পল্লীতে, মাটি খুঁড়ে কবর দেবার অবসর কই? খরস্রোতা নদীগুলোও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মরা টানতে টানতে।

শান্তিপ্রিয় মানুষ সব ভীত, ত্রস্ত; এই বুঝি সাইরেন বাজবে, আর সাথে সাথে আরম্ভ হবে নরহত্যা যজ্ঞ। একমুহূর্তে বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে; মানুষের বহু কষ্টে গড়া ওই সুন্দর শহর, বহু মূল্যবান মিউজিয়াম আর বহু সাধনার পর সৃষ্ট ওই বিশাল পাঠাগার।

এই বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেল কৃষকের রক্ত দিয়ে বোনা পাটের গাছগুলো, আর শ্রমিকের একমাত্র মাথা গুঁজবার সম্বল খোলার ঘরটি।

বহু কথা, বহু ছবি, একনিমেষে, চলচ্চিত্রের মতো রেখাপাত করে গেল আমার মানসপটে।

গরিব চাষী রহিম শেখের চোখে ঘুম নেই। ঘুম নেই ওর লিকলিকে বৌটির চোখে, আর অবলা মেয়েটির চোখে। পেটের অশান্ত পোকাগুলোর তীব্র দংশনে ছটফট করছে ওরা, ঘুম কী করে আসবে।

ইজ্জত গেল! ইজ্জত গেল ওদের। মান-সম্মান নিয়ে বাঁচা বুঝি দায় হয়ে পড়ল এবার। শিকারি কুকুরের দল ওত পেতে আছে গোরা সৈন্যগুলো সব। বন্ধ দোরের আড়াল থেকে দুরু দুরু বুকে কাঁপছে গ্রাম্য তরুণীরা। মাতৃময়ী বাঙালি নারীর দেহ নিয়ে চারদিকে চলছে ছিনিমিনি খেলা, অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানরা সব ইতস্তত ছড়িয়ে আছে আঁস্তাকুড়ের ছাইয়ের গাদায়, শহরের নর্দমায়, আর জলপচা খানা-ডোবায়।

একহাত কাড়। শুধু একহাত কাপড় আর একমুঠো ভাতের জন্য ওরা বিক্রি করে দিচ্ছে ওদের আপন পেটের ছেলেমেয়েকে আর কলমা পড়ে বিয়ে-করা বৌকে।

কী একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। শুধু একটা মহাসমর। আর মানুষগুলোকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল আদিম যুগের নরখাদকের দেশে।

জানো ডাক্তার? মেয়েটির গলার স্বরে হঠাৎ চিন্তার স্রোতটা মাঝপথেই বাধাপ্রাপ্ত হল, চেয়ে দেখলাম মেয়েটি আবার বলতে আরম্ভ করেছে—এ পৃথিবীতে বিচার বলে কিছু নেই। বিচার যদি থাকত, তাহলে এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের কেউ বিচার করল না কেন? ওদের রচিত আইনে আছে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, যার আশ্রয় নিয়ে ওরা দৈনন্দিন কত নিরাপরাধীকে ফাঁসে ঝুলিয়ে মারে। কিন্তু ওদের বেলায় এ আইন কোথায় গেল? তুমিই বলো ডাক্তার! পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় হত্যাকাণ্ড আর কোনোদিন ঘটেছিল কি? দ্যাখো, সেই খুনী আসামিদের মানুষগুলো সব মাথায় তুলে নাচছে, গলায় মালা পরিয়ে বলছে—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর! অদ্বিতীয় মহামানব।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ও, বাতাসের মৃদু প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, দূরে ফ্রন্টের সৈন্যদের ঘুম আরো-ঘনীভূত হয়ে এসেছে, ভোরের হিমেল হাওয়ার মৃদু পরশে।

ডাক্তার। আবার ওর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তোমার কাজের খুব ক্ষতি করে ফেললাম ডাক্তার! কিছু মনে করো না, ভোর হয়ে এল প্রায়। দেখছ না আকাশের তারাগুলো সব একে-একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে?

আমি চুপ, ও আবার বলল—আচ্ছা ডাক্তার, বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি কোন্‌টা বলতে পারো?

হঠাৎ এ প্রশ্নের হেতু? নিজের মনকেই নিজে প্রশ্ন করলাম প্রথমে, তারপর উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, প্লেগ, যার দ্বারা আক্রান্ত হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ মারা যায়।

অদ্ভুত কথা শুনালে ডাক্তার। ভ্রূজোড়া কপালে উঠে এল মেয়েটির। প্লেগ একটা রোগ তা জানি, সে রোগের ঔষধ আবিষ্কার করবার জন্যও তোমরা অনেক চেষ্টা করছ। কিন্তু আশ্চর্য ডাক্তার, যুদ্ধ নামক যে ব্যাধিটা ঘণ্টায় হাজার হাজার মানুষের জীবন নাশ করে চলেছে, তার প্রতিরোধের জন্য তোমরা কী করছ? তোমরা রোগের চিকিৎসা করো,

একটা মানুষকে বাঁচাবার জন্য তোমাদের কত সাধ্যসাধনা, কত সংগ্রাম। কিন্তু, লাখো মানুষের মৃত্যুকে তোমরা নির্লিপ্তের মতো উপেক্ষা করে যাচ্ছ কেন?

শুধু বিস্মিত হলাম না, অবাকও হলাম, এ নারী বলে কী?

ও আবার বলল—একটা কাজ করতে পারবে ডাক্তার। একটা মহৎ কাজ।

মুখ ফুটে কিছু বলতে হল না আমার। চোখ দুটোই জানিয়ে দিল। কী কাজ, আগে সেটাই বল, পারি তো নিশ্চয়ই করব।

ভয় পেয়ো না ডাক্তার! তোমায় আমি এমন কোনো কাজের ভার দেব না, যা তুমি বইতে পারবে না। ও এবার আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আমি অবাক হলাম, ওর চোখের পলক পড়ে না কেন? ও বলতে আরম্ভ করল—তোমায় আমি বলব না যে, তুমি যুদ্ধটা থামিয়ে দাও, শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও! কারণ তা তোমার একার কাজ নয়। তুমি একা তা পারবে না।

ওর দৃষ্টি তখন দূর দিগন্তের সীমারেখার দিকে প্রসারিত। চোখের তারায় তারায় আশার স্ফুলিঙ্গ দেদীপ্যমান। ও আবার বলে চলল—কিন্তু একটা কথা জানো ডাক্তার? মাটির মানুষগুলো নিশ্চয়ই একদিন জাগবে। আর শয়তানদের মুখোশ খুলে ফেলবে তারা! তাদের জাগরণের দুর্বার স্রোতে কোথায় ভেসে যাবে যুদ্ধের দালালরা আর অত্যাচারী ধনকুবেরেরা। তখন একটা নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হবে; যেখানে দুঃখ দুর্দশা অভাব অনটন বলে কিছু থাকবে না, মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ, এত হিংসা-বিদ্বেষ, সবকিছুর অবসান হবে। আর পৃথিবীতে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হবে, নয় কি ডাক্তার?

কী কাজ তা তো এখনো বললে না তুমি। ওর কথার মাঝখানেই বাধা দিলাম। যদিও ওর কথাগুলো বাঁচবার উদ্দীপনা আর নূতন সৃষ্টির প্রেরণা দিচ্ছিল আমাকে। কিন্তু সময় বড্ড কম।

হ্যাঁ ডাক্তার। কাজের কথাটাই এবার তোমায়। মেয়েটি এবার ডানদিকে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর সামনে একটা ঝোপের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলল—ওই যে ডাক্তার। চেয়ে দেখ! গাছের আড়ালে একটা দালানের ভাঙা কার্নিশ দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? ও জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

হ্যাঁ, আবছা দেখতে পাচ্ছি! আমি সায় দিলাম।

তোমাকে সেখানে যেতে হবে ডাক্তার!

কিন্তু কেন?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এক অদ্ভুত হাসি খেলে গেল মেয়েটির দু-ঠোঁটের মাঝপথ দিয়ে; আমি শপথ করে বলতে পারি, অমন ব্যথাতুর হাসি আমার জীবনে আমি কাউকে হাসতে দেখিনি। ও বলল, যাও ডাক্তার! নিজ চোখেই দেখবে।

কী ভাবছ ডাক্তার? আমার অন্যমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে ও আবার প্রশ্ন করল।

হুঁ!......কই কিছু না তো!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি কিছু ভাবছিলে।

ভাবছিলাম? ও......হ্যাঁ, ভাবছিলাম তোমার কথা।

আমার কথা?

হ্যাঁ, ভাবছিলাম পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোক যদি তোমার মতো হত, তাহলে কী সুন্দরই না হত এ পৃথিবীটা।

ও......! মেয়েটি এবার আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে তাকাল, অন্ধকার দূর হয়ে ফরসা হয়ে আসছে আকাশ। আর দাঁড়ালাম না সেখানে, এগিয়ে চললাম সেই ভাঙা কার্নিশটা লক্ষ করে। কিছুদূর এসে একবার পিছন দিকে ফিরে চাইলাম, ও দাঁড়িয়ে আছে, নিথর নিষ্কম্প, পলকহীন চাহনি। তারপর গুনে গুনে আরও গোটা পঞ্চাশেক পদক্ষেপ সামনে এসে আর একবার ফিরে চাই—নেই ও নেই, ওর চিহ্নও নেই।

কাদের পদশব্দ? মাটির ওপর ভারি বুটজুতার আওয়াজ না? এক নয়, অনেক। গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়ালাম, খাকি ইউনিফর্ম-পরা সৈন্যগুলো হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি করে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল, তারপর......অনেকক্ষণ......অনেক উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্ত কেটে গেল, অপেক্ষায় আছি, ওরা কখন বেরুবে। হ্যাঁ, একসময় ওরা বেরিয়ে এল, এলোমেলো উষ্কখুষ্ক চুল, শৃঙ্খলাহীন পদবিক্ষেপে ওরা একের গায়ের উপর অন্যে হেলে পড়ল। আর মাঝে মাঝে এমন বিশ্রী কতকগুলো শব্দের উচ্চারণ করতে লাগল, যা সভ্য মানুষকে বলতে আমি কোনোদিনও শুনিনি।

রুদ্ধনিশ্বাসে আরো কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা ধীরে ধীরে কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেক দিনের পুরনো বাড়ি। দেয়ালে চুনকাম পড়েনি, তাও কয়েক বছর হবে। মরচে পড়া জানালা দরজাগুলো, কোনো রকম ঝুলে আছে। ঘরের দেয়ালে অসংখ্য মাকড়সার জাল। দেয়ালে টাঙানো একখানা ফটো।

কে?......চমকে পিছিয়ে এলাম দু-হাত। আধভাঙা ড্রেসিংটেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ফটোটা নামিয়ে নিলাম, অতি সন্তর্পণে। রুমাল দিয়ে ধুলোবালিগুলো ঝেড়ে নিলাম, তারপর দু-চোখ ভরে তার দিকে তাকালাম। সেই অপরূপা তরুণী, মুখের কোণে স্নিগ্ধ হাসির রেখা, নিচে ছোট করে লেখা নাম : সু—ই—সা।

ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারটা টানতেই খুলে গেল। অনেকগুলো খাতাপত্র সাজানো রয়েছে, থাকে থাকে, শুধু ধুলোবালি জমে আছে চারপাশে। একখানা খাতা হাতে তুলে নিলাম, কবিতার খাতা, প্রথম পৃষ্ঠাতেই লাল কালিতে লেখা বড় বড় করে কটা লাইন।

যুদ্ধ আমি চাই না, কারণ—যুদ্ধ এমন একটা ব্যাধি যে শুধু দুর্বল এবং রোগা লোকের জীবন হরণ করে না; সুস্থ, সবল এবং সতেজ মানুষকেও হত্যা করে।

আমি শান্তি চাই ; কারণ শান্তি মানুষকে... তারপর পাতার পর পাতা উল্টে গেলাম। আর দেখে গেলাম, কবিতার পর কবিতা। শেষের কবিতা একটু শব্দ করেই পড়লাম :

হে আমার ভীরু মন।
চলার পথে কভু যদি
উন্মত্ত সাগর কিবা
ক্ষুধিত ব্যাঘ্রেরও
সম্মুখীন হই।
তুমি আমারে পিছিয়ে এনো না।
শক্তি দিয়ো। সাহস দিয়ো!
যেন-সে সাগর আমি ডিঙাতে পারি।
সে ব্যাঘ্র যেন হত্যা করতে পারি।
আর—আমার
রুটি, রুজি আর অধিকারের
দাবি নিয়ে যখন
আমি এগিয়ে যাব।—
সামনে উদ্ধত রাইফেল দেখে,
তুমি আমার মাথা নত করে দিয়ো না।
আমার রুগ্না মায়ের কথা চিন্তা করে
আমার নগ্ন বৌ-এর
সকরুণ চাহনির কথা মনে করে
আর—আমার হতভাগা
শিশুর শোচনীয় মৃত্যুর
কথা স্মরণ করে
তুমি আমাকে রুখে
দাঁড়াবার সামর্থ্য দিয়ো!
শক্তি দিয়ো!
যদি ওরা গুলি চালায়—চালাতে দাও।
ভীত হয়ো না তুমি—কত
মারবে ওরা?
শত?......হাজার? লক্ষ? কোটি?
এর চেয়েও বেশি?
না-গো, না, ওদের গুলি
ততক্ষণে ফুরিয়ে যাবে।
আর—এক কোটি প্রাণের
পরিবর্তে শতকোটি
প্রাণ মুক্তি পাবে
শোষণের জিঞ্জির হতে।

পড়া শেষ করে খাতাগুলো ড্রয়ারের ভেতর রেখে দিলাম। হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম,—বেলা এগারটা। খক্ ...খক্ করে কে যেন কাশল, আশেপাশে কোথায়! তারপর অস্পষ্ট কাতরানির শব্দ...মাগো। ...আর যে পারি না মা। পাশের রুমে ঢুকতেই মেঝের উপর অনেকগুলো বোতলের ভগ্নাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। মেঝেটা একেবারে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চাপলাম, পচা মদের গন্ধ বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছে।

তারপর যে রুমটিতে পা দিলাম, সেটা একটা লম্বা হলরুম। সামনে একটা জ্যান্ত বাঘ দেখলেও বুঝি এত চমকাতাম না—আমি যেমন করে চমকে উঠলাম। শুধু অবাক হলাম না, শরীর যেন হিম হয়ে এল আমার। শরীরের তন্ত্রীগুলো একমুহূর্তের জন্য অচল থেকে আবার সচল হয়ে এল, পা দুটো দু-বার ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে তারপর স্থির হল। ঝাপসা দৃষ্টিশক্তিকে আরো প্রসারিত করে আমি ওদের দিকে তাকালাম।

উলঙ্গ। একেবারে উলঙ্গ বিবস্ত্রা নারীদেহ সব ছড়িয়ে আছে মেঝের উপর, এখানে ওখানে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মাটির ঢেলার মতো। শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে ওদের শীর্ণ হাতগুলো, দেয়ালের আঙটার সাথে। কাতরাচ্ছে ওরা—মাগো! আর যে সইতে পারি না মা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। উহ্! বারকয়েক ঘুরপাক দিয়ে উঠল আমার মাথাটা। মানুষগুলো সব কি পশু হয়ে গেল নাকি? মনুষ্যত্বের এতটুকু নিদর্শনও কি তাদের ভেতর অবশিষ্ট নেই।

অসংযত পা দুটো খুট করে শব্দ করে উঠল, ক্ষুধিত সিংহের সামনে পড়লে, নিরস্ত্র মানুষ যেমন ভয়ার্ত চিৎকার করে ওঠে, ওরাও ঠিক তেমনি আর্তনাদ করে উঠল,—মাগো। এবার আর বাঁচবো না। আর, তারপর—কোটরে ঢোকা চোখগুলো উলঙ্গ করে, আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ওরা। অজস্র অভিশাপ ঝরে পড়ছে ওদের ও চোখগুলো থেকে। ওরা অভিশাপ দিচ্ছে, ওদের জন্মদাতাকে; মানুষের আদিম বন্যতাকে, আর—ওদের জীবন-যৌবন হরণকারীদিগকে।

—হাঃ! হাঃ! হাঃ! আবার মেজর কলিনসের সেই অট্টহাসি, আবার রক্তাক্ত সুরা হাতে বলে যাওয়া, মেজর কলিনসের সেই কথাগুলো,—হাঃ! হাঃ! হাঃ! ইরান, তুরান আর মিশরের নেকাব-পরা মেয়ের মোমের মতো দেহগুলো আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি হয়ে রইবে। রাশ্যার উজবেকি আর কাজাকি তরুণীর শালীনতার বুকে ছুরি হেনে, ওদের ন্যাংটা নাচাব আমরা, ভারতের লজ্জাবতী মাংসপিণ্ডগুলোর ঘোমটা উলটিয়ে আমরা চুমো খাব। আর আমাদের কামনা চরিতার্থের জন্য ওদের আমরা ব্যবহার করব। ঠিক জুতো আর মুজোকে আমরা যে-রকম ব্যবহার করে থাকি।

যন্ত্রচালিতের মতো এসে দাঁড়ালাম ওদের পাশে। অবাক হল ওরা, যখন আমি ওদের বাঁধনগুলো একে একে খুলে দিতে লাগলাম। ওদের ভয় দূর হল, লজ্জা এসে পূরণ করল ভয়ের স্থান, ওরা শীর্ণ হাত-দুটো দিয়ে বুকটাকে ঢেকে, পাশের ঘরটাতে পালিয়ে গেল।

সব শেষে, শুধু আর একটিমাত্র বাকি, ওর বাঁধনটা খুলতে গিয়ে ইলেকট্রিকের শক্ পাওয়ার মতো আমি লাফিয়ে উঠলাম। এত ঠাণ্ডা এত শীতল।

হতভাগী মেয়েটা মারা গেছে। গলার স্বরটা কেঁপে উঠল আমার। আর সাথে সাথে একটা মেয়ের করুণ চিৎকার শোনা গেল পাশের ঘর থেকে—দিদিগো! দি—দি। ঝড়ের বেগে সে ছুটে এল আমার সামনে মৃতা মেয়েটির পাশে, আর তার উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা দেহটাকে ধরে চিৎকার দিল প্রথমে, তারপর ওর বুকের ভেতর মুখ গুঁজে কান্নার জোয়ারে ভেসে পড়ল মেয়েটি। কে? —লু—ই—সা? অবাক বিস্ময়ে বোবা হয়ে রইলাম আমি। হ্যাঁ, লু—ই—সাই বটে। মৃতা তরুণীটি লুইসারই প্রতিকৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আমায়।

ও ঘর থেকে একজন চিৎকার করে বলল—ওর নাম, লু—ই—সা, আজ দুদিন ধরে ভীষণ ছটফট করছিল ও।

কাল বিকেলে ওকে আমি 'একফোঁটা জল! একফোঁটা জল' বলে চিৎকার করতে শুনেছি। বলল, আর একজন।

গায়ের আলেস্টারটা খুলে লুইসার নগ্নদেহটা ঢেকে দিলাম আমি। প্রচণ্ড শীতের ভেতরেও আমার কপালে বিন্দুবিন্দু ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। হতবিহ্বল নেত্রে আমি চেয়ে রইলাম, লুইসার শুকনো মুখটার দিকে, ওর জিভটা এখনও বেরিয়ে আছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে মনে হল সে চিৎকার করে বলছে—একফোঁটা জল! একফোঁটা জল!

ওর ছোটবোনটা তখনও কাঁদছে, আরও চেঁচিয়ে আরও করুণ গলায়। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম, ফোঁস করে ও সাপের মতো ফণা তুলে দূরে সরে গেল। উহ্! এ খাকি পোশাকের প্রতি কী অদ্ভুত ঘৃণা জমে আছে, ওদের বুকের পাঁজরে পাঁজরে!

আবার পদশব্দ! বেশি নয়, অল্প কয়েকটা। পাশের ঘরের মেয়েগুলো নিশ্বাস নেওয়াও বন্ধ করে ফেলল নাকি? নইলে এত গভীর নীরবতা কেন? কিন্তু ডাকবার অবসর কোথায়। লুইসার ছোটবোনটা, বার-কয় হুমড়ি খেয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে তার মৃতা বোনটিকে ফেলে। নরখাদকের গন্ধ পেয়েছে, তাই তারা পালাচ্ছে।

চোখ ফেরাতেই চেয়ে দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে মেজর কলিনস। মেজর কলিনস্ হাসছে আর বলছে, হাঃ! হাঃ! তুমিও ফুর্তি করতে এসেছ ডাক্তার? হ্যাঁ ফুর্তি করো, ফুর্তি করো ডাক্তার! আমাদের সৈন্যরা ওদের ত্রিশটা গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ফুর্তি করো ডাক্তার! ফুর্তি করো।

হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। অনুভব করলাম জর্জ, এডোয়ার্ড আর লুইয়ের আত্মা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমায়, লুইসা আমার কানে কানে বলছে,—ডাক্তার! লাখো-হাজারো মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহের কথা কি এত শিগ্‌গিরই তুমি ভুলে গেলে?

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে মেজর কলিনসের মুখে আমি বসিয়ে দিলাম চড়।

শান্তি সংগ্রামে আমার প্রথম পদক্ষেপ।

একুশের গল্প

তপুকে আবার ফিরে পাব, এ কথা ভুলেও ভাবিনি কোনোদিন। তবু সে আবার ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে। ভাবতে অবাক লাগে, চারবছর আগে যাকে হাইকোর্টের মোড়ে শেষবারের মতো দেখেছিলাম, যাকে জীবনে আর দেখব বলে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি—সেই তপু ফিরে এসেছে। ও ফিরে আসার পর থেকে আমরা সবাই যেন কেমন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। রাতে ভালো ঘুম হয় না। যদিও একটু-আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে। ভয়ে জড়সড় হয়ে যাই। লেপের নিচে দেহটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে।

দিনের বেলা অনেকেই আমরা ছোটখাটো জটলা পাকাই।

দিনের বেলা ওকে ঘিরে দেখতে আসে ওকে। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা। আমরা যে অবাক হই না তা নয়। আমাদের চোখেও বিস্ময় জাগে। দু-বছর ও আমাদের সাথে ছিল। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের খবরও আমরা রাখতাম। সত্যি কী অবাক কাণ্ড দেখ তো, কে বলবে যে এ তপু। ওকে চেনাই যায় না। ওর মাকে ডাকো, আমি হলপ করে বলতে পারি ওর মা-ও চিনতে পারবে না ওকে।

চিনবে কী করে? জটলার একপাশ থেকে রাহাত বিজ্ঞের মতো বলে, চেনার কোনো উপায় থাকলে তো চিনবে। এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

আমরাও কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি ক্ষণেকের জন্য।

অনেক কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করে কাল সকালে রাহাতকে পাঠিয়েছিলাম, তপুর মা আর বউকে খবর দেবার জন্য।

সারাদিন এখানে-সেখানে পইপই করে ঘুরে বিকেলে যখন রাহাত ফিরে এসে খবর দিল, ওদের কাউকে পাওয়া যায়নি, তখন রীতিমতো ভাবনায় পড়লাম আমরা। এখন কী করা যায় বল তো, ওদের একজনকেও পাওয়া গেল না? আমি চোখ তুলে তাকালাম রাহাতের দিকে।

বিছানার উপর ধপাস করে বসে পড়ে রাহাত বলল, ওর মা মারা গেছে।

মারা গেছে? আহা সেবার এখানে গড়াগড়ি দিয়ে কী কান্নাটাই না তপুর জন্যে কেঁদেছিলেন তিনি। ওঁর কান্না দেখে আমার নিজের চোখেই পানি এসে গিয়েছিল।

বউটার খবর?

ওর কথা বলো না আর। রাহাত মুখ বাঁকাল। অন্য আর-এক জায়গায় বিয়ে করেছে। সে কী! এর মধ্যেই বিয়ে করে ফেলল মেয়েটা? তপু ওকে কত ভালোবাসত। নাজিম বিড়বিড় করে উঠল চাপা স্বরে।

সানু বলল, বিয়ে করবে না তো কি সারাজীবন বিধবা হয়ে থাকবে নাকি মেয়েটা। বলে তপুর দিকে তাকাল সানু।

আমরাও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম ওর ওপর।

সত্যি, কে বলবে এ চারবছর আগেকার সেই তপু, যার মুখে একঝলক হাসি আঠার মতো লেগে থাকত সবসময়।

কী হাসতেই না পারত তপুটা। হাসি দিয়ে ঘরটাকে ভরিয়ে রাখত সে। সে হাসি কোথায় গেল তপুর? আজ তার দিকে তাকাতে ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে আসে কেন?

দু-বছর সে আমাদের সাথে ছিল।

আমরা ছিলাম তিনজন।

আমি, তপু আর রাহাত।

তপু ছিল আমাদের মাঝে সবার চাইতে বয়সে ছোট। কিন্তু বয়সে ছোট হলে কী হবে, ও-ই ছিল একমাত্র বিবাহিত।

কলেজে ভর্তি হবার বছরখানেক পরে রেণুকে বিয়ে করে তপু। সম্পর্কে মেয়েটা আত্মীয়া হত ওর। দোহারা গড়ন, ছিপছিপে কোটি, আপেল রঙের মেয়েটা প্রায়ই ওর সাথে দেখা করতে আসত এখানে। ও এলে আমরা চাঁদা তুলে চা আর মিষ্টি এনে খেতাম। আর গল্পগুজবে মেতে উঠতাম রীতিমতো। তপু ছিল গল্পের রাজা। যেমন হাসতে পারত ছেলেটা, তেমনি গল্প করার ব্যাপারেও ছিল ওস্তাদ।

যখন ও গল্প করতে শুরু করত, তখন আর কাউকে কথা বলার সুযোগ দিত না। সেই-যে লোকটার কথা তোমাদের বলছিলাম না সেদিন। সেই হোঁৎকা মোটা লোকটা, ক্যাপিটালে যার সাথে আলাপ হয়েছিল, ওই যে লোকটা বলছিল সে বার্নাডশ' হবে, পরশু রাতে মারা গেছে একটা ছ্যাকরা গাড়ির তলায় পড়ে। —আর সেই মেয়েটা, যে ওকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল—ও মারা যাবার পরের দিন এক বিলেতি সাহেবের সাথে পালিয়ে গেছে—রুণী মেয়েটার খবর জানত। সে কি রুণীকে চিনতে পারছ না! শহরের সেরা নাচিয়ে ছিল, আজকাল অবশ্য রাজনীতি করছে। সেদিন দেখা হল রাস্তায়। আগে তো পাটকাঠি ছিল। এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে। দেখা হতেই রেস্তোরাঁয় নিয়ে খাওয়াল। বিয়ে করেছি শুনে জিজ্ঞেস করল, বউ দেখতে কেমন।

হয়েছে, এবার তুমি এসো। উহু, কথা বলতে শুরু করলে যেন আর ফুরোতে চায় না; রাহাত থামিয়ে দিতে চেষ্টা করত ওকে।

রেণু বলত, আর বলবেন না, এত বক্‌তে পারে—।

বলে বিরক্তিতে না লজ্জায় লাল হয়ে উঠত সে।

তবু থামত না তপু। একগাল হাসি ছড়িয়ে আবার পরম্পরাহীন কথার তুবড়ি ছোটাত সে, থাকগে অন্যের কথা যখন তোমরা শুনতে চাও না; নিজের কথাই বলি। ভাবছি,

ডাক্তারিটা পাশ করতে পারলে এ শহরে আর থাকব না, গাঁয়ে চলে যাব। ছোট্ট একটা ঘর বাঁধব সেখানে। আর, তোমরা দেখো, আমার ঘরে কোনো জাঁকজমক থাকবে না। একেবারে সাধারণ, হ্যাঁ একটা ছোট্ট ডিসপেনসারি, আর কিছু না।

মাঝে মাঝে এমনি স্বপ্ন দেখায় অভ্যস্ত ছিল তপু।

এককালে মিলিটারিতে যাবার শখ ছিল ওর।

কিন্তু বরাত মন্দ। ছিল জন্মখোঁড়া। ডান পা থেকে বাঁ পাটা ইঞ্চি দুয়েক ছোট ছিল ওর। তবে বাঁ জুতোর হিলটা একটু উঁচু করে তৈরি করায় দূর থেকে ওর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাটা চোখে পড়ত না সবার।

আমাদের জীবনটা ছিল অনেকটা যান্ত্রিক।

কাকডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতাম আমরা। তপু উঠত সবার আগে। ও জাগাত আমাদের দুজনকে—ওঠো, ভোর হয়ে গেছে দেখছ না? অমন মোষের মতো ঘুমোচ্ছ কেন, ওঠো। গায়ের ওপর থেকে লেপটা টেনে ফেলে দিয়ে জোর করে আমাদের ঘুম ভাঙাত তপু। মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিয়ে বলত, দেখ, বাইরে কেমন মিষ্টি রোদ উঠেছে। আর ঘুমিয়ো না, ওঠো।

আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে, নিজহাতে চা তৈরি করত তপু।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে আমরা বই খুলে বসতাম। তারপর দশটা নাগাদ স্নানাহার সেরে ক্লাসে যেতাম আমরা।

বিকেলটা কাটত বেশ আমোদ-ফুর্তিতে। কোনোদিন ইস্কাটনে বেড়াতে যেতাম আমরা। কোনোদিন বুড়িগঙ্গার ওপরে। আর যেদিন রেণু আমাদের সাথে থাকত, সেদিন আজিমপুরার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূর গাঁয়ের ভেতরে হারিয়ে যেতাম আমরা।

রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনত বাসা থেকে। গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড়মুড় করে ডালমুট চিবাতাম আমরা। তপু বলত, দ্যাখো রাহাত, আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো?

কী ?

এই-যে আঁকাবাঁকা লালমাটির পথ, এ পথের যদি শেষ না হত কোনোদিন। অনন্তকাল ধরে যদি এমনি চলতে পারতাম আমরা।

একি, তুমি আবার কবি হলে কবে থেকে? ভ্রু-জোড়া কুঁচকে হঠাৎ প্রশ্ন করত রাহাত।

না না কবি হতে যাব কেন। ইতস্তত করে বলত তপু। তবু কেন যেন মনে হয়...।

স্বপ্নালু চোখে স্বপ্ন নামত তার।

আমরা ছিলাম তিনজন।

আমি, তপু আর রাহাত।

দিনগুলো বেশ কাটছিল আমাদের। কিন্তু অকস্মাৎ ছেদ পড়ল। হোস্টেলের বাইরে, সবুজ ছড়ানো মাঠটাতে অগুনতি লোকের ভিড় জমেছিল সেদিন। ভোর হতে ক্রুদ্ধ ছেলেবুড়োরা এসে শ্লোগান দেবার চুঙা, আবার কারো হাতে লম্বা লাঠিটায় ঝোলানো কয়েকটা রক্তাক্ত জামা। তর্জনী দিয়ে ওর জামাগুলো দেখাচ্ছিল, আর শুকনো ঠোঁট নেড়ে নেড়ে এলোমেলো কী যেন বলছিল নিজেদের মধ্যে।

তপু হাত ধরে টান দিল আমার, এসো।

কোথায়?

কেন, ওদের সাথে।

চেয়ে দেখি, সমুদ্রগভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

এসো।

চল।

আমরা মিছিলে পা বাড়ালাম।

একটু পরে পেছন ফিরে দেখি, রেণু হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

যা ভেবেছিলাম, দৌড়ে এসে তপুর হাত চেপে ধরল রেণু। কোথায় যাচ্ছ তুমি। বাড়ি চল।

পাগল নাকি, তপু হাতটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর বলল, তুমিও চল না আমাদের সাথে।

না, আমি যাব না, বাড়ি চল। রেণু আবার হাত ধরল ওর।

কী বাজে বকছেন। রাহাত রেগে উঠল আবার। বাড়ি যেতে হয় আপনি যান। ও যাবে না। মুখটা ঘুরিয়ে রাহাতের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে একপলক তাকাল রেণু। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, দোহাই তোমার, বাড়ি চল। মা কাঁদছেন।

বললাম তো যেতে পারব না, যাও। হাতটা আবার ছাড়িয়ে নিল তপু।

রেণুর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল। বললাম, কী ব্যাপার আপনি এমন করছেন কেন, ভয়ের কিছু নেই, আপনি বাড়ি যান।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে টলটলে চোখ নিয়ে ফিরে গেল রেণু।

মিছিলটা তখন মেডিক্যালের গেট পেরিয়ে কার্জন হলের কাছাকাছি এসে গেছে।

তিনজন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম।

রাহাত শ্লোগান দিচ্ছিল।

আর তপুর হাতে ছিল একটি মস্ত প্ল্যাকার্ড, তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিল, রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই।

মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছুতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগল চারপাশে। ব্যাপার কী বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি,

প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।

তপু! রাহাত আর্তনাদ করে উঠল।

আমি তখন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

দুজন মিলিটারি ছুটে এসে তপুর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেল আমাদের সামনে থেকে। আমরা এতটুকুও নড়লাম না, বাধা দিতে পারলাম না। দেহটা যেন বরফের মতো জমে গিয়েছিল, তারপর আমিও ফিরে আসতে আসতে চিৎকার করে উঠলাম, রাহাত পালাও।

কোথায়? হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল রাহাত।

তারপর উভয়েই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলাম আমরা ইউনিভার্সিটির দিকে। সে রাতে, তপুর মা এসে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিল এখানে। রেণুও এসেছিল। পলকহীন চোখজোড়া দিয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমেছিল তার। কিন্তু আমাদের দিকে একবারও তাকায়নি সে। একটা কথাও আমাদের সাথে বলেনি রেণু। রাহাত শুধু আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল, তপু না মরে আমি মরলেই ভালো হত। কী অবাক কাণ্ড দ্যাখোতো, পাশাপাশি ছিলাম আমরা। অথচ আমাদের কিছু হল না, গুলি লাগল কিনা এসে তপুর কপালে। কী অবাক কাণ্ড দ্যাখো তো।

তারপর চারটে বছর কেটে গেছে। চারবছর পর তপুকে ফিরে পাব, এ-কথা ভুলেও ভাবিনি কোনোদিন!

তপু মারা যাবার পর রেণু এসে একদিন মালপত্রগুলো সব নিয়ে গেল ওর। দুটো স্যুটকেস, একটা বইয়ের ট্রাঙ্ক, আর একটা বেডিং। সেদিনও মুখ ভার করেছিল রেণু।

কথা বলেনি আমাদের সাথে। শুধু রাহাতের দিকে একপলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ওর একটা গরম কোট ছিল না, কোটটা কোথায়?

ও, ওটা আমার স্যুটকেসে। ধীরে কোটটা বের করে দিয়েছিল রাহাত।

এরপর দিনকয়েক তপুর সিটটা খালি পড়েছিল। মাঝে মাঝে রাত শেষ হয়ে এলে আমাদের মনে হত, কে যেন গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে আমাদের।

ওঠো আর ঘুমিও না, ওঠো।

চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেতাম না, শুধু ওর শূন্য বিছানার দিকে তাকিয়ে মনটা ব্যথায় ভরে উঠত। তারপর একদিন তপুর সিটে নতুন ছেলে এল একটা। সে ছেলেটা বছর তিনেক ছিল।

তারপর এল আর একজন। আমাদের নতুন রুমমেট। বেশ হাসি-খুশি ভরা মুখ।

সে দিন সকালে বিছানায় বসে 'এনাটমি'র পাতা উল্টাচ্ছিল সে। তার চৌকির নিচে একটা ঝুড়িতে রাখা 'স্কেলিটনে'র 'স্কাল'টা বের করে দেখছিল আর বইয়ের সাথে মিলিয়ে

পড়ছিল সে। তারপর একসময় হঠাৎ রাহাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, রাহাত সাহেব, একটু দেখুন তো, আমার 'স্কাল'র কপালের মাঝখানটায় একটা গর্ত কেন?

কী বললে? চমকে উঠে উভয়েই তাকাল ওর দিকে।

রাহাত উঠে গিয়ে 'স্কাল'টা তুলে নিল হাতে। ঝুঁকে পড়ে সে দেখতে লাগল অবাক হয়ে। হাঁ, কপালে মাঝখানটায় গোল একটা ফুটো, রাহাত তাকাল আমার দিকে, ওর চোখের ভাষা বুঝতে ভুল হল না আমার। বিড়বিড় করে বললাম, বাঁ পায়ের হাড়টা দু-ইঞ্চি ছোট ছিল ওর।

কথাটা শেষ না হতেই ঝুড়ি থেকে হাড়গুলো তুলে নিল রাহাত। হাতজোড়া ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল ওর। একটু পরে উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে বলল, বাঁ পায়ের টিবিয়া ফেবুলাটা দু-ইঞ্চি ছোট। দ্যাখো, দ্যাখো।

উত্তেজনায় আমিও কাঁপছিলাম।

ক্ষণকাল পরে 'স্কাল'টা দু-হাতে তুলে ধরে রাহাত বলল, তপু। বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এল ওর।